রামধনু

দ. মামিন-সিবিরিয়াক

আলিওনুশকার গল্প

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৭৬

দ্মিত্রি মামিন-সিবিরিয়াক

হেমেন্দ্রকুমার
গল্প

রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: জ. ইউদিন

Д. МАМИН-СИБИРЯК
«АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ»
на языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

M $\frac{70801-073}{014(01)-78}$ 651-78

দ. মামিন-সিবিরিয়াক আলিওনুশকার গল্প

বাইরেটা অন্ধকার। বরফ পড়ছে। জানলার শার্সি ঢেকে গেছে তাতে। গুটিশুটি মেরে বিছানায় শুয়ে আছে আলিওনুশকা। বাবা একটা গল্প না বলা পর্যন্ত কিছুতেই সে ঘুমাবে না।

আলিওনুশকার বাবা দ্মিত্রি নারকিসভিচ মামিন-সিবিরিয়াক একজন লেখক। ভবিষ্যৎ বইয়ের পাণ্ডুলিপির ওপর ঝুঁকে টেবিলের সামনে বসে আছেন তিনি। এবার উঠলেন, আলিওনুশকার খাটের কাছে গিয়ে বসলেন আরাম-কেদারায়। শুরু হল গল্প... বোকা টার্কি পাখি ভাবলে সে বুঝি সবার চেয়ে বুদ্ধিমান, জন্মদিনে একসঙ্গে জুটল খেলনাপাতি আর কী তার ফল দাঁড়াল, এই সব শোনে মেয়েটি। প্রতিটি গল্পই চমৎকার, মন কেড়ে নেয়। তবে একটা চোখ আলিওনুশকার বুজে এসেছে এর মধ্যেই... ঘুমো আলিওনুশকা, ঘুমো রে সুন্দরী।

মাথার তলে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ে আলিওনুশকা। ওদিকে জানলার বাইরে বরফ পড়ছে তো পড়ছেই...

বাপে আর মেয়েতে শীতের লম্বা সন্ধেগুলো কাটায় এইভাবেই। আলিওনুশকার মা ছিল না, মারা গেছেন তিনি অনেক আগেই। বাপ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন মেয়েটিকে, তার সুখের জন্যে যথাসাধ্য করতেন।

ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি, মনে পড়ল তাঁর নিজের ছেলেবেলাকার কথা। সেটা কেটেছে উরালের একটা ছোটো কারখানা অঞ্চলে। জন্ম তাঁর অনেক কাল আগে — ১৮৫২ সালে। তখন কারখানায় খাটত ভূমিদাস মজুরেরা। খাটত তারা সেই সকাল থেকে রাত অবধি, কিন্তু দিন কাটত দারিদ্র্যে। অথচ তাদের মনিবেরা থাকত বিলাসে ব্যসনে। ভোরে মজুরেরা যখন যেত কারখানায়, তখন তাদের সামনে দিয়ে ছুটত তিন ঘোড়ার 'ত্রয়কা' গাড়ি। সারা রাত ধরে বল নাচের পর বাড়ি ফিরছে বড়ো লোকেরা।

মামিন-সিবিরিয়াকের জন্ম গরিব পরিবারে। প্রতিটি কড়িই গোনাগাঁথা। তবে তাঁর মা-বাপেরা ছিলেন ভালো লোক, সদাশয়। লোকে আসতে চাইত তাঁদের কাছে।

আর বাড়িতে কারখানার মিস্ত্রিরা নেমন্তন্নে এলে ভারি ভালো লাগত ছেলেটির। কত গল্প আর মন-কাড়া ঘটনার কথাই না তারা জানত। মামিন-সিবিরিয়াকের খুবই মনে পড়ে দুরন্ত দস্যু মারজাককে নিয়ে কিংবদন্তী। অনেক কাল আগে মারজাক ডেরা পেতেছিল উরালের বনে। হামলা করত ধনীদের ওপর, তাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিত গরিবদের মধ্যে। জারের পুলিস কখনো তাকে ধরতে পারে নি। প্রতিটি কথা কান পেতে শুনত ছেলেটি, ইচ্ছে হত নিজেই সে হবে মারজাকের মতো অমনি দুঃসাহসী, ন্যায়পরায়ণ।

গহন বন, মারজাক একসময় যেখানে লুকিয়ে থাকত, তার শুরুটা বাড়ি থেকে কয়েক মিনিটের পথ। শাখা-প্রশাখায় লাফিয়ে বেড়ায় কাঠবেড়ালি, বনের কিনারায় বসে থাকে খরগোশ, আর ভেতরবাগে দেখা মিলত খোদ ভালুকের। বনের সবকটি হাঁটাপথ চেনা হয়ে যায় ভবিষ্যৎ লেখকের। ঘুরতেন তিনি চুসভায়া নদীর তীরে তীরে, মুগ্ধ হয়ে দেখতেন পাহাড়ের সারি, ফার আর বার্চ বনে ছাওয়া। সে পাহাড়ের আদি-অন্ত নেই — তাই প্রকৃতি সম্পর্কে বরাবরের মতো তাঁর মনে গেঁথে যায় 'স্বাধীনতার, উদ্দাম প্রসারের একটা ধারণা'।

ছেলেটির মনে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন তাঁর মা-বাপ। ওই বয়সেই পড়েন তিনি পুশকিন আর গোগল, তুর্গেনেভ আর নেক্রাসভ। সাহিত্যানুরাগ তাঁর দেখা দেয় অল্প বয়সেই। ষোলো বছরেই দিনলিপি রাখতে শুরু করেন।

কাটল আরো কয়েক বছর। মামিন-সিবিরিয়াক হয়ে উঠলেন উরাল-জীবনের চিত্রাংকনে প্রথম লেখক। বহু উপন্যাস লিখেছেন তিনি, শত শত গল্প। প্রাণ ঢেলে তাতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সাধারণ মানুষের কথা, অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম।

ছোটোদের জন্যেও অনেক কাহিনী আছে তাঁর। তিনি চেয়েছিলেন, শিশুরা যেন দেখতে পায়, বোঝে প্রকৃতির সৌন্দর্য, ভূমির ঐশ্বর্য, যেন ভালোবাসে, মান্য করে মেহনতী মানুষকে। বলতেন, 'ছোটোদের জন্যে লেখা এক সৌভাগ্য।'

মেয়েকে একসময় যেসব কাহিনী শোনাতেন, সেগুলিও কাগজে-কলমে ধরে রেখেছেন মামিন-সিবিরিয়াক। পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশ করে তার নাম দেন তিনি 'আলিওনুশকার গল্প'।

এসব কাহিনীতে আছে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের রঙ, বদান্য রুশী প্রকৃতির সৌন্দর্য। আলিওনুশকার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে বন, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি।

বহু রুশী লোককথার সেই চরিত্ররাই মামিন-সিবিরিয়াকের নায়ক: ঝাঁকড়ালোমো জড়ভরত ভালুক, ভুখা নেকড়ে, ভীরু খরগোশ, সেয়ানা চড়ুই। লোকেদের মতোই

তারা ভাবে, কথা বলাবলি করে। সেইসঙ্গে তারা জানোয়ারও। ভালুককে দেখা যাবে আনাড়ী, হাঁদা, নেকড়ে হিংস্র, চড়ুই জেদী, চটপটে, কুঁদুলে।

উপনামের বিশেষণে তাদের চেনা যাবে ভালো।

যেমন, মশা-দীর্ঘনাসা হল বড়োসড়ো বুড়ো মশা, আর মশকটি-লম্বানাকটি — এ হল ছোট্ট, এখনো অনভিজ্ঞ বাচ্চা মশা।

তাঁর কাহিনীতে জিনিসপত্রও প্রাণ পেয়ে যায়। খেলনাপাতিরা উৎসব জমায় এমনকি মারামারিও বাধায়। কথা বলাবলি করে গাছপালা। 'আয় ঘুম' গল্পে আছে আদর দিয়ে মাথা-খাওয়া বাগানের ফুলেদের কথা, রূপের অহঙ্কারে তাদের মাটিতে পা পড়ে না। ঠিক যেন দামী পোশাকে নবাবজাদী। কিন্তু লেখকের ভালো লাগে লাজুক মেঠো ফুল।

কোনো কোনো চরিত্রের প্রতি মামিন-সিবিরিয়াক দরদী, আবার কাউকে কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করেন। মেহনতীদের কথা তিনি লেখেন শ্রদ্ধা সহকারে, আর অলস, ফাঁকিবাজদের সমালোচনা করেন।

আর যারা গুমরে, যারা ভাবে সবকিছুই কেবল তাদের জন্যে, তাদেরও সইতে পারতেন না লেখক। 'এক যে ছিল শেষের মাছিটি' গল্পে আছে এক বোকা মাছির কথা। তার ধারণা ছিল ঘরবাড়ির জানলা শুধু এইজন্যে যাতে সে উড়ে ঢুকবে, উড়ে বেরুবে, টেবিলে খাবার সাজিয়ে জ্যাম দেওয়া হচ্ছে কেবল এইজন্যে যে সে খাবে, সূর্য কিরণ দিচ্ছে কেবল তার জন্যেই। তবে বোঝাই যায়, এমন কথা ভাবা সম্ভব কেবল হাঁদারাম হাস্যকর মাছির পক্ষেই।

মাছ আর পাখির জীবনে মিলটা কোথায়? 'চড়ুই বাবু, মাছ মিয়া আর ফুর্তিবাজ ঝাড়ুদার ইয়াশা' গল্পে লেখক তার জবাব দিয়েছেন। মাছ যদিও জলে থাকে আর চড়ুই ওড়ে বাতাসে, তাহলেও মাছ-পাখি দুজনেরই দরকার খাদ্য, ছোটে ভালোমন্দ কিছু মুখে দিতে, শীতে ঠাণ্ডায় জমে, গ্রীষ্মে কতরকম দুর্ভাগ্যে পড়ে...

সবাই মিলে একসঙ্গে খাটলে তার জোর অনেক। ভালুকের গায়ে অসুরের মতো শক্তি, কিন্তু একসঙ্গে জোট বেঁধে মশারাও তাকে হারিয়ে দিতে পারে ('মশা-দীর্ঘনাসা আর ঝাঁকড়া-ভালুক — লেজ এইটুক')।

তাঁর সমস্ত বইয়ের মধ্যে মামিন-সিবিরিয়াক বিশেষ ভালোবাসতেন 'আলিওনুশকার গল্প'। বলতেন: 'এটা আমার প্রিয় বই। লিখেছে তা ভালোবাসা নিজেই, তাই অন্যগুলোর চেয়ে এটা টিকে থাকবে।'

আন্দ্রেই চের্নিশোভ

মুখপাত

মেয়ে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল... আলিওনুশকার একটা চোখ ঘুমোয়, অন্যটা চেয়ে থাকে, একটা কান ঘুমোয়, অন্যটা শোনে। ঘুমো রে আলিওনুশকা, ঘুমো সুন্দরী। বাবা তোকে গল্প বলবে। মনে হচ্ছে সবাই তো হাজির: সাইবেরিয়ার বেড়াল ভাসকা, ঝাঁকড়ালোমো গেঁয়ো কুকুর পস্তোইকো, ফোকর-বাসী ইঁদুর মাসি, চুল্লির ওপাশে ঘরোয়া ঝিঁঝিঁ, খাঁচায় ফুট-ফুটকি হরবোলা পাখি, আর বদরাগী মোরগ।

ঘুমো আলিওনুশকা, এক্ষুনি

গল্প শুরু হবে। ঐতো জানলা দিয়ে দেখছে উঁচু আকাশের চাঁদের ফালি; ট্যারা খরগোশ টলছে তার হাইবুটে; নেকড়ের চোখে ঝিলিক দিল হলদে ছটা; মিশকা ভালুক তার থাবা চুষছে। বুড়ো চড়ুই উড়ে এল জানলায়, শার্সিতে ঠোকর দিয়ে জিজ্ঞেস করছে: আর কত দেরি? সবাই হাজির, সবাই জুটেছে, শুনবে আলিওনুশকার গল্প।

আলিওনুশকার একটা চোখ ঘুমোয়, অন্যটা চেয়ে থাকে, একটা কান ঘুমোয়, অন্যটা শোনে।

মেয়ে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল...

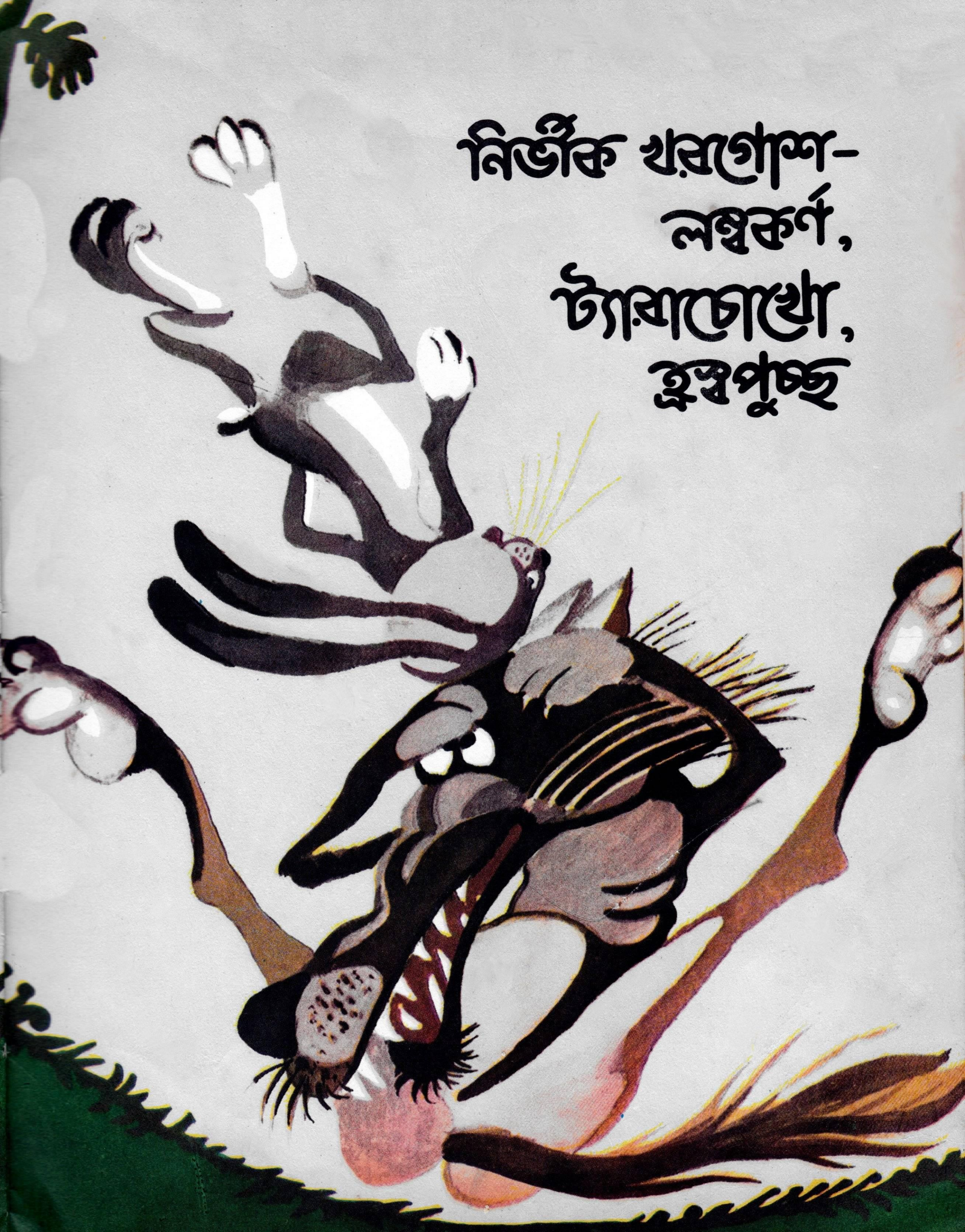
নির্ভীক খরগোশ-
লম্বকর্ণ,
ট্যারাচোখো,
হ্রস্বপুচ্ছ

‘কাউকে আমি ভয় করি না।’

খরগোশ-ছানা জন্মেছে বনে, অথচ সবকিছুতেই তার ভয়। কোথাও একটা কুটোকাটা ফাটল, ধড়ফড় করে উঠল পাখি, একদলা তুষার পড়ল গাছ থেকে, অমনি ছানার প্রাণ কণ্ঠাগত।

আজ ভয় পায়, কাল ভয় পায়, সারা সপ্তাহ, সারা বছর ধরে ভয় পায়; তারপর বড়ো হয়ে উঠল, হঠাৎ বিরক্ত ধরে গেল ভয় পেতে।

বন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে সে বললে, 'কাউকে আমি ভয় করি না। এতটুকুও ভয় করি না, বাস্!'

এসে জুটল ধেড়ে খরগোশেরা, ছুটে এল ছোটোরাও, গিন্নিরাও বাদ গেল না — সবাই শোনে বড়াই করছে লম্বকর্ণ, ট্যারাচোখো, হ্রস্বপুচ্ছ খরগোশ, — শোনে আর নিজেদের কানকেও বিশ্বাস হয় না। খরগোশ কাউকে ভয় করে না, এমন কাণ্ড তো কখনো হয় নি।

'আরে ওহে ট্যারাচোখো, নেকড়েকেও তুই ভয় পাস না?'

'নেকড়ে শেয়াল ভালুক, কাউকেই ভয় করি না!'

এতে খুবই মজা লাগল সবার। সামনের পা দিয়ে মুখ ঢেকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল বাচ্চা খরগোশেরা, হাসল ভালোমানুষ বুড়িরা, এমনকি মুখে হাসি ফুটল বুড়োদেরও, যারা শেয়ালের কবলে পড়েছে, নেকড়েদের দাঁতের মর্ম জানে। হাসালে বাপু! ওহ্, কী হাসনই না হাসালে! হঠাৎ ভারি ফুর্তি হল সবার। শুরু

হল ডিগবাজি, লাফ-ঝাঁপ, দৌড়, পাল্লা ধরাধরি। যেন পাগলা হয়ে উঠেছে সবাই।

'অত কথায় দরকার কী!' একেবারেই ভয়টয় ঝেড়ে ফেলে চেঁচাল খরগোশ, 'নেকড়ে যদি সামনে পড়ে তবে নিজেই আমি তাকে খেয়ে ফেলব...'

'ইস্, কী মজার খরগোশ! ইস্, কী হাঁদা!'

সবাই দেখছে ওটা দেখন-হাসি, হাঁদা, আর হেসে লুটিয়ে পড়ছে সবাই।

নেকড়েকে নিয়ে গলাবাজি করল খরগোশ, নেকড়েও গুটি গুটি হাজির।

বনে বনে ঘুরছিল সে তার নেকড়েমি মতলব নিয়ে, পেটে কিছু পড়ে নি, ভাবছে: 'একটা খরগোশ খেতে পারলে কী ভালোই-না হত,' হঠাৎ শোনে, খুব কাছেই খরগোশেরা চেঁচামেচি করছে, বলাবলি করছে তার, ছেয়ে নেকড়ের কথা। অমনি সে থেমে গেল, বাতাস শুঁকলে, তারপর এগুতে থাকল চুপি চুপি।

ফুর্তিতে মাতোয়ারা খরগোশদের একেবারেই কাছে এসে গেল সে, শোনে তাকে নিয়ে কী হাসাহাসি করছে ওরা, সবচেয়ে বেশি করছে বাক্যবীর খরগোশটা — ট্যারাচোখো, লম্বকর্ণ, হ্রস্বপুচ্ছ।

'আরে ভায়া, সবুর কর, তোকে তো আমিই খাব!' এই ভেবে সে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোন খরগোশটার বীরত্বের এত বড়াই। খরগোশেরা ওদিকে কিছুই টের পায় নি, ফুর্তি তাদের আরো সরগরম। শেষ পর্যন্ত বড়াইবীর খরগোশ একটা গাছের গুঁড়ির ওপর পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসে বলে উঠল:

'শোনো তোমরা, ভীতুর দল, শোনো, চেয়ে দ্যাখো আমার দিকে। এক্ষুনি আমি তোমাদের একটা কাণ্ড দেখাব। আমি... আমি... আমি...'

হঠাৎ বড়াইবীরের জিভ যেন আটকে গেল।

চোখে পড়ল, নেকড়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর কেউ দেখতে পায় নি, কিন্তু ওর চোখে পড়তেই নিঃশ্বাস আর সরে না।

তারপরে যা ঘটল, সে আর বলবার নয়।

ঠিক একটা বলের মতো গলাবাজ খরগোশটা লাফ দিলে শূন্যে আর এসে পড়ল নেকড়ের চওড়া কপালের ওপর, পিঠ বেয়ে গড়াতে গড়াতে দিলে আরো একটা লাফ, তারপর এমন ভোঁ-দৌড় যেন নিজের চামড়া ছিঁড়েই বেরিয়ে যাবে।

অনেকখন ধরে দৌড়ল বেচারা খরগোশ, তারপর জেরবার হয়ে পড়ল একেবারে। তার মনে হচ্ছিল পেছু পেছু ছুটে আসছে নেকড়ে, এই দাঁত বসাল বলে। শেষে একেবারেই শক্তি ফুরিয়ে ঝোপের তলায় লুটিয়ে পড়ল মরার মতো।

নেকড়ে ওদিকে ছুটছিল উল্টো দিকে। খরগোশ যখন তার ওপর আছড়ে পড়ে, তখন তার মনে হয় কেউ বুঝি তাকে গুলি করেছে।

তাই ছুটে পালাল নেকড়ে। বনে অন্য খরগোশ কি আর মিলবে না? কিন্তু এ যে একেবারে মাথা খারাপ হবার জোগাড়...

বাকি খরগোশেরা অনেকখন ধাতস্থ হতে পারে নি। কেউ ছোটে ঝোপে ঝাড়ে, কেউ লুকোয় গুঁড়ির পেছনে, কেউ ঢোকে গর্তে।

শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে বিরক্তি ধরে গেল সবার। যাদের কিছু সাহস আছে, একটু উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল তারা।

'সত্যি, নেকড়েকে বেড়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছে আমাদের খরগোশ।' একমত হল সবাই, 'ও না থাকলে জান নিয়ে আমাদের ফিরতে হত না... কিন্তু কোথায় সে, আমাদের নির্ভীক খরগোশ?'

শুরু হল খোঁজাখুঁজি।

যায়, যায়, কিন্তু নির্ভীক খরগোশের আর দেখা নেই। অন্য কোনো নেকড়ের পেটে যায় নি তো? শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। ঝোপের তলে গর্তে শুয়ে আছে, ভয়ে আধমরা।

'সাবাস ট্যারা!' একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠল সবাই, 'ওরে আমাদের ট্যারা! বেড়ে তুই ভয় পাইয়ে দিয়েছিস ধেড়ে নেকড়েকে। ধন্যি তুই! আর আমরা ভেবেছিলাম তুই মিছে বড়াই করছিস।'

অমনি চাঙ্গা হয়ে উঠল নির্ভীক খরগোশ। উঠে এল গর্ত থেকে, গা ঝাড়া দিলে, চোখ কুঁচকে বললে:

'আর তোমরা ভেবেছিলে-টা কী! যত ভীরুর দল...'

সেই থেকে নির্ভীক খরগোশের নিজেরই ধারণা হল সে সত্যিই বুঝি কাউকে ভয় পায় না।

মেয়ে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল...

পুনপুনে পোকা

‘সবই, সবই যে আমার...’

১

পুনপুনে পোকা কখন জন্মাল কেউ দেখে নি।

রোদঢালা বসন্তের দিন। চারিদিকে চেয়ে দেখে পুনপুনে পোকা বললে:

'বাঃ!'

নিজের ডানাদুটি ঠিক করে নিলে সে, একের পর এক সরু সরু পাদুটি ঘষল, তারপর আরো একবার চারিদিকটা দেখে বললে:

'বাঃ! কত গরম রোদ, কী নীল আকাশ, কেমন সবুজ ঘাস, — চমৎকার! আর এ সবই আমার!'

আরো একবার পায়ে পা ঘষে উড়ে গেল সে। ওড়ে, মুগ্ধ হয়ে দেখে সবকিছু, আহ্লাদ হয়। আর নিচে সবুজ সবুজ ঘাস, ঘাসের ভেতর লুকনো লালচে ফুল।

ফুল ডাকলে, 'পুনপুনে, আয় আমার কাছে!'

মাটিতে নেমে এল পুনপুনে, হুটোপুটি করে ফুলে উঠে রস খেতে লাগল।

'ভারি তুই ভালো লোক ফুল!' পা দিয়ে মুখ মুছে বললে পুনপুনে।

'ভালো নয় হলাম, কিন্তু হাঁটতে যে পারি না,' বিলাপ করলে ফুলটি।

'তাহলেও সবই কী সুন্দর,' আশ্বাস দিলে পুনপুনে। 'আর সবই আমার...'

কথা শেষ হতে না হতেই গোঁ-গোঁ করে উড়ে এল লোমশ ভিমরুল, বসলে এসে সোজা ফুলটার ওপর:

'গোঁ-গোঁ... কে এসে জুটেছে আমার ফুলে? গোঁ-গোঁ... কে খায় আমার মিষ্টি রস? গোঁ-গোঁ... আহ্, তুই হারামজাদা পুনপুনে, ভাগ এক্ষুনি! গোঁ-গোঁ-গোঁ... পালা, নইলে হুল ফুটিয়ে দেব!'

'বারে, সেকী?' চিঁ-চিঁ করে উঠল পুনপুনে, 'সবই, সবই যে আমার...

'গোঁ-গোঁ-গোঁ... না, আমার!'

রাগী ভিমরুলের কাছ থেকে কোনোরকমে সরে এল পুনপুনে, ঘাসের ওপর বসে ফুলের রসে চ্যাটচেটে পা চাটতে লাগল। রাগ হল তার:

'কী গোঁয়ার এই ভিমরুলটা! সত্যি আশ্চর্য! আবার হুল ফোটাতে আসে... অথচ সবই যে আমার — এই সূর্য, ঘাস, ফুল...'

'না বাপু, মাপ করো আমায়!' বলে উঠল শুঁয়োপোকা, ঘাসের ডাঁটি বেয়ে যাচ্ছিল সে।

পুনপুনে টের পেল যে শুঁয়ো উড়তে পারে না, তাই সাহস করে বললে:

'মাপ করো শুঁয়ো, ভুল হচ্ছে তোমার... ডাঁটি বেয়ে যেতে আমি তো তোমার পথ আটকাচ্ছি না। তাছাড়া তর্ক করো না আমার সঙ্গে!'

'বেশ... তবে আমার ঘাসটিতে শুধু হাত দেবে না। কবুল করছি, ওটি আমার পছন্দ নয়... তোমরা এখানে ওড়াউড়ি করছ, তাতে হলটা কী? তোমাদের মন বড়ো হালকা, আর আমি শুঁয়োপোকা রাশভারী লোক... খোলাখুলি বলে রাখছি — এ সবই আমার। এই ঘাসের ডাঁটিটায় উঠব, তারপর খাব। যেকোনো ফুলে গিয়ে উঠব, তাও খাব। নাও — চলি!'

২

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুনপুনে জেনে ফেলল সবকিছুই। যেমন: সূর্য, নীল আকাশ, সবুজ ঘাস ছাড়াও আছে বদরাগী ভিমরুল, রাশভারী শুঁয়ো, আর ফুলে নানারকমের কাঁটা। মোটের ওপর, খুবই দুঃখের কথা। এমনকি অভিমানই হল তার। দ্যাখো-না, তার খুবই ধারণা ছিল যে এ সবই তার, তার জন্যেই এসবের সৃষ্টি, অথচ অন্যেরাও তাই ভাবছে। উঁহু... কিছু একটা গোলমাল হয়েছে... এযে অসম্ভব।

আরো দূরে উড়ে যায় পুনপুনে, দ্যাখে — জল।

‘এটা তাহলে আমার,’ আনন্দে পিং-পিং করে উঠল পুনপুনে, ‘আমার জল... আহ্, কী চমৎকার! ঘাসও আছে, ফুলও আছে এখানে।’

আর পুনপুনের দিকে উড়ে আসে অন্যসব পুনপুনেরা।

‘নমস্কার ভাই!’

‘নমস্কার। একা একা উড়তে আমার বেজার ধরে যাচ্ছিল। এখানে কী করছিস তোরা?’

‘খেলছি ভাই... আয়-না আমাদের সঙ্গে। ফুর্তি করা যাবে এখানে... অল্প দিন হল তুই জন্মেছিস?’

‘সবে আজকে... ভিমরুল আমায় প্রায় হুল ফোটাতে এসেছিল, পরে দেখলাম শুঁয়োপোকাকে... ভেবেছিলাম সবই আমার আর ওরা বলে নাকি ওদের।’

অন্যান্য পুনপুনেরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খেলতে ডাকল। পাক দেয়, ওড়ে, পিং-পিং করে। আনন্দে আমাদের পুনপুনে একেবারে আটখানা। শিগগিরই সে ভুলে গেল বদরাগী ভোমরা আর রাশভারী শুঁয়োর কথা।

‘আহ্, কী চমৎকার!’ উল্লাসে ফিসফিস করল সে, ‘সব আমার — সূর্য, ঘাস, জল, — সবই। কেন রাগারাগি করে অন্যে, সত্যি, একদম বুঝি না। সবই আমার, কারো বেঁচে থাকায় তো আমি বাধ সাধছি না... ওড়ো-না, বনবন করো, ফুর্তি লাগাও। আমার আপত্তি নেই...’

খেলা হল পুনপুনের, ফুর্তি করা হল, তারপর জিরিয়ে নেবার জন্যে বসলে জলার হোগলার ওপর। সত্যি, জিরিয়ে নেওয়াই দরকার! অন্য পুনপুনেরা কেমন আনন্দ করছে, চেয়ে চেয়ে দেখছে সে, হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, শোঁ করে উড়ে গেল চড়ুই, যেন ঢিল ছুঁড়ল কেউ।

হাউমাউ করে উঠে পড়ি-মরি সরে গেল পুনপুনে।

আর চড়ুই যখন উড়ে চলে গেল, তখন দেখা গেল গণ্ডা কয়েক পুনপুনে আর নেই।

‘হতচ্ছাড়া ডাকু!’ গালাগালি দিলে বুড়ো পুনপুনেরা, ‘পুরো আড়াই গণ্ডাকে খেয়ে নিল।’

এটা ভিমরুলের চেয়েও খারাপ। ভয় হল পুনপুনের, অন্যান্য বাচ্চা পুনপুনেদের সঙ্গে লুকিয়ে রইল জলার ঘাসের আরো গভীরে। কিন্তু সেখানে আবার নতুন এক বিপদ। দুটি পুনপুনেকে খেলে মাছে, দুটিকে ব্যাঙে।

'ব্যাপারটা কী?' অবাক লাগল পুনপুনের, 'এ একেবারেই অনাসৃষ্টি কাণ্ড... এভাবে তো বাঁচাই চলে না। কী পাষণ্ড সব!'

ভাগ্যি ভালো যে পুনপুনে ছিল অনেক, লোকসানটা কেউ নজরই করল না। তাছাড়া উড়ে এল সবে জন্মানো নতুন নতুন পুনপুনেরাও। উড়ে উড়ে তারা পিং-পিং করতে লাগল:

'সবই আমাদের... সবই আমাদের...'

'না, সব আমাদের নয়,' তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললে আমাদের পুনপুনেটি, 'দুনিয়ায়, বাপু, আছে বদরাগী ভিমরুল, রাশভারী শুঁয়ো, পাষণ্ড চড়ুই, মাছ, ব্যাঙ। হুঁশিয়ার থেকো ভায়া!'

তবে রাত নামল। সমস্ত পুনপুনেই লুকিয়ে পড়ল হোগলায়। জায়গাটা বেশ গরম। তারা ফুটে উঠল আকাশে, দেখা দিল শশীকলা, সবেরই ছায়া পড়ল জলে।

আহ্, কী সুন্দর কাটল!

'আমার চাঁদ, আমার তারা,' মনে মনে ভাবল পুনপুনে, কিন্তু কাউকে সে কথা বললে না, তাও যদি কেড়ে নেয়...

৩

এইভাবেই গোটা গ্রীষ্ম কাটল পুনপুনের।

অনেক আনন্দ করলে সে, দুঃখকষ্টও সয়েছে অনেক। দু'দুবার তাকে প্রায় খেতে বসেছিল চটপটে মার্টলেট পাখি; চুপিচুপি কাছিয়ে এসেছিল ব্যাঙ — পুনপুনেদের শত্রু তো কম নেই! আনন্দও ছিল বৈকি। একদিন ওরই মতো আরেকটি পুনপুনের সঙ্গে দেখা হল তার। ফুঁয়োফুঁয়ো মোচ। সে বললে:

'কী সুন্দরী তুই পুনপুনে... আয় একসঙ্গে সংসার পাতি।'

একসঙ্গেই রইল তারা, খুব ভালোই দিন কাটল। সবই ওদের একসঙ্গে। একজন

যেখানে যাবে, অন্য জনও সেখানে। খেয়ালই করে নি কখন কেটে যাচ্ছে গ্রীষ্ম। শুরু হল বৃষ্টি, ঠান্ডা রাত। আমাদের পুনপুনে ডিম দিলে, লুকিয়ে রাখলে তা ঘন ঘাসের মধ্যে। বললে:

'উহ্, কী হয়রান হয়ে পড়েছি!'

কেউ দেখে নি কেমন করে সে মারা গেল।

তবে মারা তো সে যায় নি, শুধু শীতকালটুকুর জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, বসন্ত যেই আসবে অমনি ঘুম ভাঙবে তার, ফের জীবন চলবে।

মশা-দীর্ঘনাসা আর ঝাঁকড়া-ভালুক-লেজ এইটুকু

‘ওহে ভায়ারা,
পালাচ্ছে ভালুক...
ধরো, ধরো!’

১

ব্যাপারটা ঘটে ভর দুপুরে, যখন রোদের ঝাঁঝ থেকে সমস্ত মশা লুকোয় গিয়ে জলায়। দীর্ঘনাসা মশাও একটা চওড়া পাতায় গড়িয়ে নিতে গেল। ঘুমোয়, আর ঘুমের মধ্যে শোনে একটা বুকফাটা হাহাকার:

'ওরে বাবারে! কে আছ, বাঁচাও!'

পাতার তল থেকে লাফিয়ে উঠে দীর্ঘনাসাও চেঁচিয়ে উঠল:

'হলটা কী? গাঁক-গাঁক করছ কেন?'

মশারা ওদিকে কেবলি ওড়ে আর বনবন, পুনপুন করে — কিছুই বোঝার উপায় নেই।

'ওরে বাবারে! আমাদের জলায় এক ভালুক এসে কাত হয়েছে। ঘাসের ওপর শুতেই পিষে গেছে পাঁচশ মশা; নিঃশ্বাস নিতেই পেটে গেছে শতখানেক। মহা বিপদ ভাইয়েরা! আমরা কোনোক্রমে সরে এসেছি, নইলে সবাই মারা পড়তাম...'

শুনেই চটে উঠল দীর্ঘনাসা। চটল যেমন ভালুকের ওপর, তেমনি বোকা মশাগুলোর ওপরেও, খামোকা কেবল চিঁচিঁ করছে। চেঁচাল:

'ওহে, পিঁ-পিঁ করা থামাও তো! আমি এই চললাম ভালুক তাড়াতে... খুব সহজ কাজ! আর তোমরা হাউমাউ শুরু করেছ একেবারে বেমক্কা...'

উড়ে এসে আরো রেগে উঠল দীর্ঘনাসা। সত্যিই ভালুক শুয়ে আছে জলার কাছে। এসে সেঁধিয়েছে একেবারে ঘন ঘাসগুলোর মধ্যে, অনাদি কাল থেকে যেখানে

মশার বাস, গা এলিয়ে ঘুমচ্ছে, ফোঁসফোঁস করছে নাক দিয়ে, তাতে শিস বেরুচ্ছে কেবল, যেন শিঙে ফুঁকছে কেউ। কী বেহায়া হারামজাদা! পরের জায়গায় ঢুকে পড়ে মিছেমিছি কত মশার প্রাণ নিল, তাতে আবার কেমন আরাম করে ঘুম মারা হচ্ছে!

'ওহে চাচা, কোথায় এসে সেঁধিয়েছ?' সারা বন ফাটিয়ে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল দীর্ঘনাসা যে তার নিজেরই ভয় ধরল।

এক চোখ মেলল ঝাঁকড়ালোমো, কাউকে দেখা যাচ্ছে না, মেলল দ্বিতীয় চোখটাও, কোনোরকমে চোখে পড়ল একটা মশা উড়ছে নাকের কাছে।

'কী চাই তোর স্যাঙাৎ?' গজগজ করে উঠল ভালুক, তারও রাগ হচ্ছিল, 'একটু গড়িয়ে নিতে গেছি, অমনি কে এক ব্যাটা এসে চিঁ-চিঁ লাগিয়েছে।'

'ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো হে চাচা!'

দুই চোখই মিলল ভালুক, বেহায়াটাকে চেয়ে দেখল, তারপর নাক দিয়ে ফোঁৎ শব্দ করে একেবারেই ক্ষেপে উঠল:

'কী চাই তোর হতভাগা বদমাইস?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আমাদের জায়গা ছেড়ে ভাগ। আমার সঙ্গে তামাশা নয়... ছাল-চামড়া সুদ্ধ তোকে খেয়ে নেব।'

হাসি পেল ভালুকের। পাশ ফিরে শুয়ে সে থাবা দিয়ে মুখ ঢেকেই শুরু করল নাক ডাকাতে।

২

মশাদের কাছে ফিরে এল দীর্ঘনাসা, সারা জলা ফাটিয়ে চেঁচাল:

'ঝাঁকড়ালোমোকে একেবারে বেদম ভয় পাইয়ে দিয়েছি! আর কখনো ঘেঁষবে না।'

অবাক হয়ে মশারা তাকে শুধোয়:

'কিন্তু এখন ভালুকটা কোথায়?'

'জানি না ভায়ারা... বললাম, না ভাগলে খেয়ে ফেলব, তখন ঘাবড়ে গেল ভয়ানক। আমার কাছে তো আর ঠাট্টা চলবে না, সোজাসুজি তাই বলে দিলাম: খেয়ে নেব। তোমাদের এখানে যতক্ষণ উড়ে আসছি, ততক্ষণের ভেতর আবার পটল না তোলে... তা কী করা যাবে, দোষ তো নিজেরই!'

পিং-পিং করে উঠল মশারা, বনবন করে উঠল, অনেকখন ধরে তর্ক চলল কী করা যায় এই চাষাড়ে ভালুকটাকে নিয়ে। এমন ভয়াবহ চেঁচামেচি জলায় আর কখনো শোনা যায় নি। পিং-পিং করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ভালুকটাকে তাড়াতে হবে জলা থেকে।

'ঘুমতে হয় বাড়ি গিয়ে ঘুমোক। জলা আমাদের... এই জলাতেই বাস করে গেছে আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা।'

মগজওয়ালা এক বুড়ি মশা পরামর্শ দিলে, ভালুককে না ঘাঁটানোই ভালো। শুয়ে আছে থাকুক, ঘুম ভাঙলে নিজেই চলে যাবে। কিন্তু সবাই তার ওপর এমন রুখে উঠল যে বেচারা কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচল।

'চলো যাই ভায়ারা!' সবার চেয়ে চিৎকার করলে দীর্ঘনাসা, 'আমরা ওকে দেখিয়ে দেব!'

দীর্ঘনাসার পেছু পেছু উড়ে চলল মশারা। উড়ছে, পিং-পিং করছে, ভয় লাগছে নিজেদেরই। উড়ে এসে দ্যাখে, শুয়ে আছে ভালুক, নড়ন-চড়ন নেই।

'কী, বলেছিলাম-না? ভয়েই পটল তুলেছে বেচারি!' বড়াই করলে দীর্ঘনাসা, 'দুঃখই হচ্ছে খানিকটা, কেমন দশাসই ভালুক ছিল...'

'আরে ও ঘুমচ্ছে ভায়ারা,' পিং-পিং করে বললে ছোট্ট একটা মশা। উড়ে গিয়েছিল সে ভালুকের একেবারে নাকের কাছে, আরেকটু হলেই নিঃশ্বাসের টানে নাকের ভেতরেই চলে যেত।

'ইস্, লজ্জাও নেই মুখপোড়ার,' একসঙ্গে কলরব করে উঠল সমস্ত মশা, শুরু হল মহা হুলুস্থুল। 'পাঁচশ মশাকে পিষে মেরেছে, একশ জনকে গিলে খেয়েছে, আর নিজে ওদিকে ঘুম মারছেন যেন কিছুই হয় নি...'

ঝাঁকড়ালোমো ভালুক কিন্তু ঘুমিয়েই চলে, শিস বেরয় নাক দিয়ে।

'ব্যাটা ঘুমানোর ভান করছে,' চেঁচিয়ে দীর্ঘনাসা উড়ে গেল ভালুকের কাছে, 'ব্যাটাকে দেখাচ্ছি... ওহে চাচা, থাকো-না মটকা মেরে!'

দীর্ঘনাসা উড়ে গিয়ে ভালুকের ঠিক কালো নাকটিতে কামড় বসাতেই লাফিয়ে উঠল ভালুক, থাবা মারলে নাকে, কিন্তু দীর্ঘনাসা ততক্ষণে সটকে পড়েছে।

'কী চাচা, মিষ্টি লাগল?' চিঁ-চিঁ করে দীর্ঘনাসা, 'সরে পড়ো, নইলে আরো

খারাপ দাঁড়াবে... আমি এবার আর একা নই... সঙ্গে আছে দাদু — দীর্ঘতমনাসা, আছে ছোটো ভাই মশকটি — লম্বানাকটি! সরে পড়ো চাচা...'

'যাব না!' পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে গর্জে উঠল ভালুক, 'তোদের সবাইকেই পিষে মারব...'

'চাচা হে, মিছে বড়াই...'

ফের দীর্ঘনাসা উড়ে গিয়ে কামড় বসালে সোজা ভালুকের চোখে। যন্ত্রণায়, থাবা দিয়ে চড় মারলে মুখে, ফের কিছুই ধরা পড়ল না থাবায়, শুধু আরেকটু হলেই চোখ উপড়ে আসত নখে। দীর্ঘনাসা ওদিকে ভালুকের একেবারে কানের কাছটিতে উড়ে উড়ে বলে:

'আমি তোমায় খাব চাচা...'

৩

শেষে পুরোপুরি রেগে উঠল ভালুক। শেকড় সুদ্ধ একটা গোটা বার্চ গাছকে উপড়ে সে মারতে লাগল মশাদের। প্রাণপণে হাঁকায়... মারে, মারে, একেবারে হয়রান হয়ে পড়ল, কিন্তু মশা মারা পড়ল না একটিও। সবাই বনবন করছে তার মাথার ওপর, চেঁচাচ্ছে। তখন ভালুক ভারি একটা পাথর ছুঁড়ে মারল তাদের দিকে। এবারেও কোনো ফল হল না।

'কী চাচা, পারলে?' বললে দীর্ঘনাসা, 'যতই করো, খেয়ে নেব তোমায়...'

মশাদের সঙ্গে ভালুক লড়েছিল কতক্ষণ কে জানে, তবে চেঁচামেচি হয়েছিল অনেক। বহু দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ভালুকের গর্জন। আর কত গাছই-না সে উপড়েছে, কত পাথরই-না ছুঁড়েছে! ভারি তার ইচ্ছে হয়েছিল প্রথম দীর্ঘনাসাটাকে ধরতে, সে তো একেবারে তার কানের কাছে বনবন করছে। থাবা মেরে ধরতে যায়, কিন্তু মশা ততক্ষণে নেই, আঁচড়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল মুখখানা।

শেষ কালে শক্তি ফুরিয়ে গেল ভালুকের। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসল সে, ফোঁৎফোঁৎ করলে, তারপর এক নতুন ফন্দি মাথায় খেলল তার — ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেওয়া যাক, মশার রাজ্য গুঁড়িয়ে দেব। গড়াগড়ি দিলে ভালুক, অনেক গড়াগড়ি দিলে, কিন্তু ফল কিছু হল না, শুধু আরো হয়রান হয়ে গেল সে। ভালুক

তখন মুখ গুঁজলে শ্যাওলায়। ফল দাঁড়াল আরো খারাপ। মশারা ছেঁকে ধরল তার লেজ। তখন একেবারে ক্ষেপে গেল ভালুক।

'দাঁড়া, তোদের দেখাচ্ছি...' এমন সে গর্জে উঠল যে শোনা গেল দু'ক্রোশ দূর থেকেও, 'তোদের মজা আমি টের পাওয়াচ্ছি, আমি... আমি... আমি...'

সরে গেল মশারা, অপেক্ষা করে — দেখি কী হয়। ভালুক ওদিকে বাঁশ-বাজিকরের মতো উঠে গেল গাছে, বসল সবচেয়ে মোটা ডালটিতে, চেঁচাল:

'কী, এবার আসবি আমার কাছে... সব নাক থেঁতলে দেব!'

সরু গলায় হেসে উঠল মশারা, সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভালুকের ওপর। পিঁ-পিঁ করে, পাক খায়, হামলা করে... প্রাণপণে তাদের ঠেকায় ভালুক, অজান্তে পেটে চলে গেল শতখানেক মশক সৈন্য, ফলে কাশতেই বস্তার মতো ধপাস করে পড়ল ডাল থেকে... তাহলেও উঠে দাঁড়াল সে, চোট খাওয়া জায়গাটা খানিক চুলকে বললে:

'কী, পারলি? দেখলি কেমন খাশা লাফ দিতে পারি গাছ থেকে?'

আরো মিহি গলায় হেসে উঠল মশারা, আর দীর্ঘনাসা কেবলি শাসায়:

'আমি তোমায় খাব... খাব... খাব!'

একেবারে জেরবার হয়ে গেল ভালুক, শক্তি ফুরিয়ে গেল, কিন্তু জলা ছেড়ে যেতেও পারে না, লজ্জার ব্যাপার। পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে সে কেবল চোখ মিটমিট করে।

বাঁচাল তাকে ব্যাঙ। চাঙড়ের তল থেকে লাফিয়ে এসে বসল উঁচু হয়ে। বললে:

'মিছেমিছি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন জাম্ববান? ওই সব ওঁছা মশাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করবেন না। তার যুগ্যি নয় ওরা।'

'যুগ্যি নয়ই তো,' খুশি হয়ে উঠল ভালুক, 'আমি শুধু এমনি... আসুক-না একবার আমার গুহায়। আমি তখন, আমি...'

ফিরে দাঁড়িয়ে জলা থেকে পালাল ভালুক, আর দীর্ঘনাসা ওদিকে উড়ে আসে আর চেঁচায়:

'ওহে ভায়ারা, পালাচ্ছে ভালুক... ধরো, ধরো!'

মশারা এসে জুটল সবাই, শলা-পরামর্শ করলে, ঠিক হল: 'লাভ নেই। চলেই যাক — জলাটা তো আমাদেরই রইল!'

ভানকার জন্মদিন

‘ফুর্তি চালাও ভাইসব!’

১

ড্রাম পেটাও — দ্রুম-দ্রুম! দুরুর-দুরুর-দ্রুম! বাজাও শিঙা — পোঁ-পোঁ! পোঁ-পোঁ-পোঁ! লাগাও সর্বকিছু বাজনা — আজ ভানকার জন্মদিন! অতিথি-সজ্জন, আসুন... সবাই আসুন! দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম! তিতুর-তিয়া! তিতুর-তিয়া!

লাল কামিজ পরে পায়চারি করে ভানকা, বলে:

'বসুন ভাই... খাবার কত চাই। কাঠের সবচেয়ে টাটকা ফালির স্যুপ, সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে পরিষ্কার বালির কাটলেট, রঙচঙে কাগজের পিঠে, আর চা কী! সবচেয়ে ভালোরকম ফোটানো জল দিয়ে। আসুন, বসুন... বাজনা লাগাও!'

দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম! তিতুর-তুয়া! তিতুর-তুয়া!

আমন্ত্রিতে ভরে উঠল গোটা ঘর। সবচেয়ে আগে ছুটে এল ভুঁড়িপেট কাঠের লাট্টু।

'বন-বন... যার জন্মদিন, সে কোথায়? বন-বন... ভালো দল জুটলে আমি ফুর্তি করতে খুবই ভালোবাসি...'

এল দুটি পুতুল। একজন আনিয়া, নীল চোখ, নাকটা খানিকটা ভেঙে গেছে। আরেকজন কাতিয়া, চোখ তার কালো, একটা হাত নেই। এল তারা ছিমছাম ঢঙে, বসলে খেলনা সোফায়।

আনিয়া বললে, 'দেখা যাক, কেমন খাবার করেছে ভানকা। বড়ো যে বড়াই করছে। বাজনাটা মন্দ নয়, তবে খাবারের ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

'তোর আনিয়া, কিছুতেই তুষ্টি নেই,' ভর্ৎসনা করলে কাতিয়া।

'আর সর্বদাই তর্ক বাধাস তুই।'

কিছুটা তর্ক করলে পুতুলদুটো, এমনকি ঝগড়া বাধারও উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু ঠিক এইসময় এল ভয়ানক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড একঠেঙে এক ক্লাউন, এসেই ওদের মিটমাট করিয়ে দিলে।

'সবই খাশা হবে দিদিমণি! চমৎকার ফুর্তি করা যাবে। আমার অবিশ্যি একটা পা নেই, কিন্তু ঐতো এক পায়েই কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে লাট্টু। নমস্কার লাট্টু...'

'বন-বন... নমস্কার! তোর একটা চোখে কেমন যেন কালশিটে পড়েছে কেন?'

'ও কিস্যু না... সোফা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। আরো কত দুর্ঘটনা হয় লোকের।'

'ওহ্, কী বিছছিরিই না হয়... মাঝে মাঝে আমি ঘুরতে ঘুরতে সোজা মাথা ঠুকে বসি দেয়ালে!'

'ভাগ্যি ভালো যে মাথাটায় তোর কিছু নেই...'

'তাহলেও ব্যথা তো করে... বন-বন... নিজে একবার ঠুকে দেখো-না, তাহলে বুঝবে।'

কাঁসর বাজাতে লাগল ক্লাউন। লোকটা সে মোটের ওপর ফাজিল।

এল পেত্রুশকা, তার সঙ্গে একপাল নিমন্ত্রিত: নিজের বৌ মাত্রিওনা ইভানভনা, জার্মান ডাক্তার কার্ল ইভানিচ আর লম্বা-নাক জিপসি, জিপসি আবার সঙ্গে এনেছে তিনপেয়ে ঘোড়া।

'নাও, অতিথ বরণ করো ভানকা,' নিজের নাকে টোকা মেরে ফুর্তির স্বরে বললে পেত্রুশকা, 'এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। এক আমার মাত্রিওনা ইভানভনারই দাম কত... চা খেতে ভারি ভালোবাসে, ঠিক যেন হাঁস।'

'চা-ও হবে পেত্রুশকা,' বললে ভানকা, 'ভালো লোক এলে আমরা খুবই খুশি হই... বসুন মাত্রিওনা ইভানভনা, বসুন কার্ল ইভানিচ...'

আরো এল ভালুক আর খরগোশ, বুড়ির ছেয়ে রঙের ছাগল আর ঝুঁটিওয়ালা হাঁস, মোরগ আর নেকড়ে — কুলিয়ে গেল সবারই জায়গা।

সবশেষে এল আলিওনুশকার ঝাঁটা আর জুতো। তাকিয়ে দেখল সব জায়গা ভরে গেছে। ঝাঁটা বললে:

'তাতে কী হয়েছে, আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকব...'

জুতো কিছুই না বলে চুপচাপ ঢুকে পড়ল সোফার তলে। খুবই মানী জুতো, যদিও হিল ক্ষয়ে গেছে। একটু তার অস্বস্তি লাগছিল ফুটোটার জন্যে, সেটা ঠিক জুতোর ডগাতেই। তবে, ওতে আর কী, সোফার তলে কেউ তা লক্ষ্য করবে না।

'এই! বাজনা লাগাও!' হুকুম দিল ভানকা।

বেজে উঠল ড্রাম — দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম! তান ধরল শিঙা — তিতুর-তিয়া! তিতুর-তিয়া! হঠাৎ ভারি আনন্দ হল সবার...

২

উৎসবের শুরুটা হল চমৎকার। আপনা থেকেই বাজছে ড্রাম, আপনা থেকে শিঙা, বনবন করছে লাট্টু, কাঁসরগুলো দিয়ে ঝনঝন শব্দ তুলছে ক্লাউন আর অবিরাম কিঁচকিঁচ করে চলেছে পেত্রুশকা। ওহ্, কী আনন্দ!

'ফুর্তি চালাও ভাইসব,' কোঁকড়া শণের মতো চুলে হাত বুলিয়ে থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে ভানকা।

আনিয়া আর কাতিয়া হাসতে লাগল মিহি গলায়, বেঢপ ভালুক নাচ জুড়ল ঝাঁটার সঙ্গে, ছাই রঙের ছাগল বেড়াতে লাগল ঝুঁটিওয়ালা হাঁসকে নিয়ে, ডিগবাজি খেতে লাগল ক্লাউন, দেখাল তার ওস্তাদি, আর কার্ল ইভানিচ জিজ্ঞেস করতে লাগল মাত্রিওনা ইভানভনাকে:

'মাত্রিওনা ইভানভনা, পেটে আপনার ব্যথা করে না?'

'কী বলছেন কার্ল ইভানিচ,' আহত বোধ করল মাত্রিওনা ইভানভনা, 'হঠাৎ একথা কেন?'

'আচ্ছা, জিভটা দেখান তো।'

'থামুন বাপু...'

'আমি এখানে...' সরু গলায় ঠুনঠুন করে উঠল চামচ, এটি দিয়ে পরিজ খায় আলিওনুশকা।

এতক্ষণ পর্যন্ত সে চুপচাপ শুয়ে ছিল টেবিলে, কিন্তু ডাক্তার জিভের কথা তুলতেই সে আর চুপ করে থাকতে পারল না; লাফিয়ে উঠল, ডাক্তার সর্বদাই যে আলিওনুশকার জিভ দেখে চামচ দিয়ে...

'আরে না... দরকার নেই!' চিঁচিঁ করে বললে মাত্রিওনা ইভানভনা, এমন ভাবে হাত নাড়াতে লাগল যে হাসি পায়, ঠিক যেন হাওয়াই কল।

অভিমান হল চামচের, 'আমি তো আর গায়ে পড়ে কারো উপকার করতে যাচ্ছি না।'

এমনকি রেগেই উঠতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় ছুটে এল লাট্টু, শুরু হল ওদের নাচ। বন-বন করতে লাগল লাট্টু, ঠুন-ঠুন করতে লাগল চামচে। আলিওনুশকার জুতো আর পারলে না, সোফার তল থেকে বেরিয়ে এসে ফিসফিস করলে ঝাঁটার কানে কানে:

'আমি তোমায় খুবই ভালোবাসি ঝাঁটা।'

আবেশে চোখ বুজল ঝাঁটা, হালকা নিঃশ্বাস ফেললে। ভারি তার সাধ কেউ তাকে ভালোবাসুক।

সে তো সর্বদাই বিনয়ী ঝাঁটা, কারো কারো যা অভ্যেস, তেমন দেমাক দেখাত না কখনো। যেমন মাত্রিওনা ইভানভনা কিংবা আনিয়া আর কাতিয়া। মিষ্টি এই পুতুলগুলো পরের খুঁত দেখলেই হাসাহাসি করে: ক্লাউনের একটা ঠ্যাং নেই, পেত্রুশকার নাকটা লম্বা, কার্ল ইভানিচের মাথায় টাক, জিপসিটা দেখতে সিগারেটের টুকরোর মতো, তবে সবচেয়ে নাক সিঁটকাল তারা যার জন্মদিন সেই ভানকাকে নিয়ে।

'খানিকটা চাষাড়ে,' বললে কাতিয়া।

'তাছাড়া বড়ো বড়াই করে,' যোগ দিলে আনিয়া।

আমোদ-প্রমোদের পর সবাই খেতে বসল, শুরু হল সত্যিকারের ভোজ। খাওয়া চলল সত্যিকারের জন্মদিনের মতোই, যদিও ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি বাদ গেল না। ভুল করে কাটলেটের বদলে খরগোশকেই খেতে যাচ্ছিল ভালুক, চামচে নিয়ে জিপসির সঙ্গে লাট্টুর প্রায় মারামারি — জিপসি ছিল সেটা চুরি করার মতলবে, পকেটস্থও করেছিল। পেত্রুশকা বরাবরের কুঁদুলে, ঝগড়া বাধালে বৌয়ের সঙ্গে, একেবারে অকারণে ঝগড়া।

‘শান্ত হোন মাত্রিওনা ইভানভনা,’ ওকে বোঝাতে লাগল কার্ল ইভানিচ, ‘পেত্রুশকা তো লোক ভালো… আপনার মাথা ধরেছে কি? মোক্ষম ওষুধ আছে আমার কাছে…’

‘রাখুন ডাক্তার, ওর সঙ্গে বাস করা একেবারে অসম্ভব…’ বললে পেত্রুশকা, ‘অথচ আমি ওকে খুবই ভালোবাসি। মাত্রিওনা ইভানভনা, এসো চুমু খাওয়া যাক…’

‘হুররে!’ চেঁচিয়ে উঠল ভানকা, ‘ঝগড়ার চেয়ে এটা অনেক ভালো। লোকে চটাচটি করলে আমি সইতে পারি না। দ্যাখো সবাই…

কিন্তু ঠিক এই সময় যা ঘটল, তা একেবারেই কেউ আশা করে নি, এত ভয়ংকর যে বলতেও গা ছমছম করে।

বাজল ড্রাম — দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম! বাজল শিঙা — তিতুর-তিয়া! তিতুর-তিয়া! ঝনঝন করল ক্লাউনের কাঁসরগুলো, রুপোলী গলায় হাসল চামচে, বন-বন করলে লাট্টু, আর আমোদে খরগোশ চেঁচিয়ে উঠল, ‘ওঁ-ওঁ-ওঁ!’ চীনেমাটির কুকুর জোর ঘেউ-ঘেউ লাগাল, রবারের বেড়াল করলে মিউ-মিউ, আর এমন দাপাদাপি জুড়ল ভালুক যে কাঁপতে লাগল মেঝে। সবচেয়ে ফুর্তি দেখাল বুড়ির ছেয়ে ছাগল। প্রথমত, নাচছিল সে সবার চেয়ে খাশা, তারপর ভারি মজার ভঙ্গিতে দাড়ি নেড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় ডাকতে লাগল — ব্যা-ব্যা!

৩

আচ্ছা, কীকরে এসব ঘটল? গুছিয়ে বলা অসম্ভব, কেননা যারা ছিল, তাদের ভেতর সব ব্যাপারটা মনে আছে কেবল আলিওনুশকার জুতোর। মাথায় বুদ্ধি ছিল তার, সময়মতো লুকিয়ে পড়েছিল সোফার নিচে।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা হয়েছিল এই: প্রথমে ভানকাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিল কাঠের চৌকোগুলো… উঁহু, ফের গোলমাল হচ্ছে। শুরুটা মোটেই তা থেকে নয়। চৌকোগুলো এসেছিল ঠিকই, তবে সব দোষ ওই কালোচোখ কাতিয়ার। সেই দোষী, সে-ই, একেবারে ঠিক কথা! খাওয়া যখন শেষ হতে চলেছে সুন্দরী এই পাজিটা তখনই আনিয়ার কানে কানে বলে:

'কী মনে হয় তোর আনিয়া, কে এখানে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে?'

মনে হবে, প্রশ্নটা তেমন আর কী, কিন্তু মাত্রিওনা ইভানভনা ভয়ানক রেগে গিয়ে সরাসরি বলে দিলে কাতিয়াকে:

'তোমরা ভেবেছ কী, আমার পেত্রুশকা কুৎসিত?'

'কেউ তা ভাবছে না মাত্রিওনা ইভানভনা,' কৈফিয়ৎ দিতে গেল কাতিয়া, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে।

'নাক ওর অবিশ্যি খানিকটা বড়োসড়ো,' বলে চলল মাত্রিওনা ইভানভনা, 'কিন্তু সেটা তো চোখে পড়ে কেবল পাশ থেকে দেখলে... তাছাড়া ভয়ানক চিঁচিঁ করা আর সবার সঙ্গে মারামারি বাধাবার একটা বদভ্যাস ওর আছে, তাহলেও লোকটা তো সে ভালো। আর বুদ্ধির কথা যদি ধরি...'

এমন উত্তেজনায় তর্ক জুড়ল পুতুলগুলো যে সবার নজর গেল তাদের দিকে। সবার আগে নাক গলালে স্বভাবতই পেত্রুশকা। কিঁচকিঁচ করে সে বললে:

'ঠিক কথা মাত্রিওনা ইভানভনা... এখানকার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চেহারা আমার বৈকি!'

এতে অপমান বোধ করল সমস্ত পুরুষেই। দ্যাখো-না, কী হামবড়া এই পেত্রুশকাটা! ওর কথা শুনতেও বমি আসে! বলা-কওয়ায় খুব পটু ছিল না ক্লাউন, রাগ হল তার মনে মনে। ডাক্তার কার্ল ইভানিচ কিন্তু চিৎকার করেই বললে:

'তার মানে সবাই আমরা হতকুচ্ছিৎ? আপনাদের খুরে নমস্কার মশাই...'

সঙ্গে সঙ্গেই হুলুস্থুল পড়ে গেল। নিজের ভাষায় কী যেন চিৎকার করে উঠল জিপসি, গরগর করতে লাগল ভালুক, ডাক জুড়ল নেকড়ে, ব্যা-ব্যা করে উঠল ছেয়ে ছাগল, বনবন করতে লাগল লাট্টু — মোটের ওপর পুরোপুরি রেগে উঠল সবাই।

ভানকা সবাইকে বোঝাতে লাগল, 'থামুন মশাই, থামুন। পেত্রুশকার কথায় কান দেবেন না... ও স্রেফ ঠাট্টা করছিল।'

কিন্তু সবই বৃথা। সবচেয়ে চটে উঠেছিল কার্ল ইভানিচ। টেবিলে ঘুসি মেরে সে চেঁচাল:

'চমৎকার নেমন্তন্ন মশাইরা, বলবার কিছু নেই! খেতে ডেকে আমাদের শোনানো হল যে আমরা হতকুচ্ছিৎ...'

'মান্যবরা আর মান্যবরেরা,' সবার চেয়ে চেঁচাবার চেষ্টা করল ভানকা, 'ব্যাপার যদি এই দাঁড়ায়, তাহলে কুৎসিত এখানে কেবল একা আমি... এবার হল তো?'

তারপর... দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু ঝালিয়ে নিই। হ্যাঁ, ঘটেছিল এই: কার্ল ইভানিচ একেবারে ক্ষেপে উঠে এগিয়ে গেল পেত্রুশকার দিকে। আঙুল তুলে শাসিয়ে বললে:

'আমার যদি শিক্ষাদীক্ষা না থাকত, ভদ্রসমাজে সৌজন্য রক্ষার যোগ্যতা যদি না রাখতাম, তাহলে সোজাসুজি বলে দিতাম, পেত্রুশকা, আপনি আস্তো একটি আহাম্মক...'

পেত্রুশকার মারমুখী স্বভাব জানা থাকায় ভানকা দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে তার মুঠোটা গিয়ে পড়ল পেত্রুশকার লম্বা নাকের ওপর। পেত্রুশকার মনে হল ঘুসিটা মেরেছে ডাক্তার... তারপর যা শুরু হল-না! পেত্রুশকা আঁকড়ে ধরল ডাক্তারকে। কথা নেই, বার্তা নেই, জিপসি মারতে লাগল ক্লাউনকে। গর্জে উঠে ভালুক ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ের ওপর, লাট্টু তার ফাঁপা মাথাটা ঠুকতে লাগল ছাগলের গায়ে, মানে একেবারে কেলেঙ্কারি ব্যাপার। মিহি গলায় চিঁ-চিঁ করলে পুতুলগুলো, তারপর তিনটেই মূর্ছা গেল একসঙ্গে।

'উহ্, শরীর খারাপ লাগছে আমার!' সোফা থেকে গড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল মাত্রিওনা ইভানভনা।

'কী ব্যাপার মশাইরা?' চিৎকার করে উঠল ভানকা, 'অন্তত আজ তো আমার জন্মদিন! এটা যে ভারি খারাপ দেখায়!'

শুরু হল একেবারে সত্যিকারের হুড়োহুড়ি, বোঝা যায় না কে মারছে কাকে। মিছেই ভানকা মারামারি থামাবার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত নিজেই সে শুরু করল হাতের কাছে যাকে পায় তাকে মারতে। আর জোর তার সবার চেয়ে বেশি বলে নিমন্ত্রিতদের হাল হল খারাপ।

'বাঁচাও! বাপরে... বাঁচাও!' ডাক্তারকে যত পারে মারতে মারতে সবচেয়ে বেশি চেঁচাল পেত্রুশকা, 'মেরে ফেললে পেত্রুশকাকে... বাঁচাও!'

হুড়োহুড়ি থেকে বেরিয়ে আসে কেবল জুতো, ঠিক সময়েই সে লুকিয়ে পড়েছিল সোফার তলায়। ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল সে, আর ঠিক এই সময়েই তার পেছনে এসে লুকায় খরগোশ, সেও চাইছিল পালিয়ে বাঁচতে।

‘কোথায় সেঁধচ্ছিস তুই ?’ গজগজ করলে জুতো।

‘চুপ, ওদের কানে যাবে, তখন আমাদেরও দফা রফা,’ জুতোর ডগার ছ্যাঁদাটা দিয়ে চেয়ে বোঝালে টেরাচোখো খরগোশ, ‘কী দস্যি এই পেত্রুশকা… পিটচ্ছে সবাইকে আর নিজে চেঁচাচ্ছে পরিত্রাহি। বেশ অতিথি সব, বলবার কিছু নেই… নেকড়ের হাত থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছি, উঃ! ভাবতেও ভয় করে… ওই তো হাঁস পড়ে আছে ঠ্যাং তুলে চিৎপাত হয়ে, মেরে ফেলেছে বেচারিকে…’

‘ইস্, কী বোকা তুই খরগোশ। পুতুলগুলো সব মূর্ছা গেছে, সেই সঙ্গে হাঁসও।’

চলল, চলল মারামারি, শেষ পর্যন্ত সমস্ত নিমন্ত্রিতদের ভাগিয়ে দিল ভানকা, রইল শুধু পুতুলগুলো। অনেক আগেই মূর্ছায় পড়ে থাকতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল মাত্রিওনা ইভানভনার। একটা চোখ মেলে সে জিজ্ঞেস করলে:

‘কোথায় আমি ? ডাক্তার, আমি কি বেঁচে আছি ?’

কেউ জবাব দিলে না তার কথার, মাত্রিওনা ইভানভনা তখন আরেকটা চোখও মেললে। ঘর ফাঁকা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভানকা, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে চারিদিকে। জ্ঞান ফিরল আনিয়া আর কাতিয়ার, অবাক লাগল তাদেরও।

‘ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে এখানে,’ বললে কাতিয়া, ‘খাশা জন্মদিন, বলবার কিছু নেই।’

একসঙ্গে ভানকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুতুলগুলো, ভানকা কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না কী জবাব দেবে। কেউ তাকে মেরেছে, সেও কাকে মেরেছে, কিন্তু কী জন্যে কে জানে।

‘কী করে এসব ঘটল একেবারেই বুঝতে পারছি না,’ হাত নেড়ে সে বললে, ‘সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমি যে ওদের সবাইকেই ভালোবাসি… সবাইকেই।’

‘কী করে ঘটল আমরা জানি,’ সোফার তল থেকে বলে উঠল জুতো আর খরগোশ, ‘সবই আমরা দেখেছি !’

‘ওহো, ওরাই তাহলে দোষী’, ঝাঁপিয়ে এল মাত্রিওনা ইভানভনা, ‘নিশ্চয় তোরাই… জল ঘোলা করে নিজেরা থেকেছে লুকিয়ে।’

‘ওরাই, ওরাই !’ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল আনিয়া আর কাতিয়া।

'বটে, এই ব্যাপার!' খুশি হয়ে উঠল ভানকা, 'ভাগ এক্ষুনি, দস্যি কোথাকার... নেমন্তন্নে আসো কেবল ভালোমানুষদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে।'

কোনোক্রমে জানলায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল জুতো আর খরগোশ।

'আমি তোমাদের...' ঘুসি পাকিয়ে শাসাল মাত্রিওনা ইভানভনা, 'ইস্, দুনিয়ায় বদ লোক কত! এইতো, হাঁসও সেই কথা বলবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...' সায় দিলে হাঁস, 'সোফার তলে ওদের লুকোতে দেখেছি নিজের চোখে।'

সবসময়েই সবার সঙ্গেই হাঁস সায় দেয়।

'অতিথিদের ফিরিয়ে আনা দরকার...' বললে কাতিয়া, 'এখনো আরো ফুর্তি করা যাবে...'

আগ্রহ করেই ফিরল অতিথিরা। কারো চোখে কালশিটে, কেউ খোঁড়াচ্ছে, পেত্রুশকার লম্বা নাকটাই জখম হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

খরগোশ আর জুতোকে গালাগালি দিয়ে সবাই সমস্বরে বলে উঠল:

'ইস্, কী ডাকাত! এযে ভাবতেও পারি নি!'

'উহ্, কী হয়রান হয়ে পড়েছি! হাত দুখানার দফা রফা,' অনুযোগ করলে ভানকা, 'যাকগে, যা হয়েছে, হয়েছে, মনে করে লাভ কী... আমি অমন রাগ পুষে রাখি না। ওহে, লাগাও বাজনা!'

ফের ড্রাম বেজে উঠল — দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম! বাজল শিঙা — তিতুর-তিয়া! তিতুর-তিয়া! আর পেত্রুশকা অনবরত চেঁচাতে লাগল:

'হুররে ভানকা!'

চড়ুই বাবু, মাছ মিয়া আর ফুর্তিবাজ ঝাড়ুদার ইয়াশা

মজাটা হল মন্দ নয়...

১

চড়ুই বাবু আর মাছ মিয়ার মধ্যে ভারি ভাব। গ্রীষ্মে রোজ চড়ুই বাবু নদীতে উড়ে গিয়ে ডাকত:

'এই ভাই, নমস্কার! কেমন আছিস?'

মাছ মিয়া জবাব দিত, 'আছি একরকম। চলে যাচ্ছে। আয়-না আমার কাছে, আমার এখানে গভীর জায়গাগুলো ভারি চমৎকার... জল শান্ত, জোলো ঘাস, পানা — কত চাই। তোকে খেতে দেব ব্যাঙের ডিম, কেঁচো, জলের পোকা...'

'ধন্যবাদ ভাই! খুশি মনেই তোর বাড়িতে নেমন্তন্নে যেতাম, তবে জলে বড়ো ভয়। বরং তুই উড়ে আয় আমার কাছে চালে... আমি ভাই তোকে ফল-পাকুড় খাওয়াব। আমার এখানে পুরো একটা বাগান। তারপর রুটির খোসা, যব, চিনি, জ্যান্ত মশাও জোগাড় করা যাবে। তুই তো চিনি ভালোবাসিস, তাই না?'

'চিনি কী জিনিস?'

'ওই যে শাদা-শাদা...'

'আমাদের নদীর নুড়ির মতো?'

'আরে হ্যাঁ। আর খেয়ে দেখবি — মিষ্টি। তোর নুড়ি তো আর খাওয়া যায় না। চল উড়ে যাই ছাদে, এ্যাঁ?'

'উঁহু, উড়তে আমি পারি না, তাছাড়া বাতাসে খাবি খেয়ে মরব। তার চেয়ে চলে আয় একসঙ্গে সাঁতার কাটি দুজনে। সব আমি দেখাব তোকে...'

জলে নামার চেষ্টা করল চড়ুই বাবু — হাঁটু জলে যেতেই ভয় করে ওঠে। এযে ডুবে মরার জোগাড়! নদীর টলটলে জল খায় চড়ুই বাবু, আর গরমের সময় অগভীর কোনো জায়গায় চান করে নেয়, সাফ-সুফ করে পালক, তারপর ফের চালটিতে। মোটের ওপর বেশ মিলে মিশে থাকত ওরা, ভালোবাসত নানান বিষয় নিয়ে আলাপ করতে।

'সমানে জলে পড়ে থাকতে তোর বিরক্তি ধরে না?' প্রায়ই অবাক হত চড়ুই বাবু, 'জল যে ভেজা, সর্দি লাগবে...'

মাছ মিয়ারও অবাক লাগত:

'উড়ে উড়ে তোর বেজার লাগে না ভাই? রোদ্দুরে কী গরম, ঠিক মারা পড়বি। আর আমার এখানে বরাবরই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সাঁতরা-না যত খুশি। গ্রীষ্মে সবাই আসে আমার কাছে চান করতে... আর চালে তোর কাছে কে যাবে?'

'আসবে না মানে, কী বলিস ভাই! বড়ো এক বন্ধু আছে আমার — ইয়াশা ঝাড়ুদার। প্রায়ই সে আসে আমার কাছে বেড়াতে... ভারি ফুর্তিবাজ, কেবলি গান গায়। গান গেয়ে গেয়ে চিমনি সাফ করে। বসে চালের উঁচু ডগায়, রুটি বার করে খায়, আমি টুকরো-টাকরা জোটাই। গলায় গলায় আমাদের ভাব। আমিও তো ফুর্তি ভালোবাসি।'

বন্ধুদের বিপদ-আপদ যা ঘটে, তাও প্রায়ই একই রকমের। যেমন শীতকালটা: কীরকম জমে যেত চড়ুই বাবু! উহ্, কী ঠাণ্ডা পড়ত! মনে হত প্রাণটা পর্যন্ত জমে যাবে। মুষড়ে পড়ত চড়ুই বাবু, বসে থাকত পা গুটিয়ে। শুধু একটা বাঁচোয়া — চিমনির মধ্যে কোথাও গিয়ে একটু গরম হয়ে নেওয়া। তবে সেখানেও বিপদ।

একবার তার সেরা বন্ধু ঝাড়ুদারের কল্যাণে প্রায় মারা পড়তে বসেছিল চড়ুই বাবু। চিমনি পরিষ্কার করতে এল ইয়াশা, ঝাড়ু সমেত লোহার ভারটা নামাতেই চড়ুই বাবুর প্রায় পটল তোলার অবস্থা। একেবারে কালিঝুলি মেখে লাফিয়ে বেরুল চিমনি থেকে, গালাগালি দিতে লাগল:

'তুই করছিস কী ইয়াশা! মারা যেতাম যে...'

'কিন্তু তুই যে ওখানে বসে আছিস তা জানব কোত্থেকে?'

'এবার থেকে সাবধান হবি... আমি যদি লোহার ভারটা তোর মাথায় মারতাম, ভালো হত?'

মাছ মিয়ারও শীতটা সুখে কাটত না। বরফে ঢাকা নদীর গভীরের কোনো একটা খোঁদলে গিয়ে সারাটা দিন ঝিমাত। অন্ধকার, ঠাণ্ডা, নড়াচড়ারও ইচ্ছে হয় না। জল নেবার জন্যে লোকে যেখানে বরফে গর্ত করত, চড়ুই বাবুর ডাক শুনে মাঝে মাঝে উঠে আসত সেখানে। চড়ুই বাবু জায়গাটায় আসত জল খেতে, ডাকত:

'এই মাছ মিয়া, বেঁচে আছিস তো?'

'আছি,' ঘুম-ঘুম গলায় সাড়া দিত মাছ মিয়া, 'শুধু ঘুম পাচ্ছে কেবলি। মোটের ওপর ভারি বিছছিরি। সবাই ঘুমচ্ছে আমাদের এখানে।'

'আমাদের অবস্থাও ভালো নয় ভাই। উপায় কী, সহ্য করে যেতে হবে... উহ্, কীরকম হাড়-জ্বালানে বাতাস বয়! তাতে ঘুমের দফা রফা... একটু গরম হয়ে নেবার জন্যে আমি কেবলি লাফাই এক ঠ্যাঙে। তা দেখে লোকে বলাবলি করে: 'দ্যাখ, দ্যাখ, কেমন ফুর্তিবাজ চড়ুই!' কবে যে গরমকাল আসবে! কীরে, ফের ঘুমচ্ছিস নাকি?'

গ্রীষ্মেও দুঃখকষ্ট কম নয়। একবার এক বাজপাখি মাইল খানেক ধরে চড়ুইকে তাড়া করেছিল, কোনোক্রমে বাঁচে নদীর খাড়া পাড়ের পেছনে লুকিয়ে।

'ওহ্, আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম,' অনুযোগ করলে সে মাছ মিয়ার কাছে। 'একেবারে ডাকাত! ধরতে পারলে বাস্, স্রেফ লোপাট।'

'এ আমাদের বোয়াল মাছের মতো,' সান্ত্বনা দিলে মাছ মিয়া, 'আমিও সেদিন অল্পের জন্যে তার পেটে যাই নি। কীরকম তেড়ে এসেছিল আমার দিকে, যেন বিদ্যুৎ। অন্য মাছেদের সঙ্গে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাবছিলাম জলে বুঝি একটা কাঠ পড়ে আছে, আর কীভাবে ছুটে এল সে কাঠ... বোয়ালগুলো কেন যে জন্মায়? ভেবে তাজ্জব লাগে...'

'আমারও... কী জানিস, আমার মনে হয় বাজপাখিরা একসময় ছিল বোয়াল, আর বোয়ালরা বাজ। অর্থাৎ ডাকাত...'

২

এইভাবেই দিন কাটত চড়ুই বাবু আর মাছ মিয়ার, শীতকালে ঠাণ্ডায় জমত, আনন্দ করত গ্রীষ্মে। আর ফুর্তিবাজ ইয়াশা চিমনি সাফ করত আর গান গাইত। সবারই নিজের নিজের মতো কাজ, নিজের নিজের সুখ আর দুঃখ।

একদিন গ্রীষ্মে ইয়াশা তার কাজ সেরে নদীতে গেল গায়ের ঝুলকালি ধোবার জন্যে। যাচ্ছে শিস দিতে দিতে, হঠাৎ শোনে ভয়ঙ্কর হট্টগোল। ব্যাপার কী? দ্যাখে, নদীর ওপর হাঁস, রাজহাঁস, ভরত পাখি, কাক, পায়রা, কাদাখোঁচা, যতরকমের পাখি সব ঝটপট করছে, সবাই চেঁচাচ্ছে, ডাক ছাড়ছে, হাসছে, মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না!

'ওহে, কী ঘটল?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে ইয়াশা।

'যা ঘটেছে...' চটপটে চামচিকে চিঁচিঁ করে উঠল, 'সে একেবারে হাসির ব্যাপার! দ্যাখো, দ্যাখো কী করছে আমাদের চড়ুই বাবু... একেবারে পাগলা হয়ে গেছে।' মিহি গলায় হেসে উঠে, লেজ টুকুনি নেড়ে ঝটপট করতে লাগল নদীর ওপর।

ইয়াশা নদীর কাছে আসতেই চড়ুই বাবু উড়ে এল তার দিকে। কী ভয়ঙ্কর মূর্তি: দু' ঠোঁট ফাঁক করা, চোখ জ্বলছে, খাড়া হয়ে উঠেছে সমস্ত পালক।

'এই চড়ুই বাবু, কী গোলমাল লাগিয়েছিস এখানে?' জিজ্ঞেস করলে ইয়াশা।

'না, আমি ওকে দেখাব!' চিৎকার করল চড়ুই বাবু, রাগে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়, 'ও আমায় এখনো চেনে না... হতভাগা মাছ মিয়াকে দেখাচ্ছি, শয়তান কোথাকার।'

'শুনিস না ওর কথা,' জল থেকে চেঁচাল মাছ মিয়া, 'সব মিথ্যে...'

'মিছে কথা বলছি আমি?' চিৎকার করলে চড়ুই বাবু, 'কিন্তু কেঁচোটা পেয়েছিল কে? আমি নাকি মিথ্যে বলছি! কী পুরুষ্টু পোকা! আমি ওকে তীরের মাটি থেকে খুঁড়ে বার করি... মেহনত গেল কত... পোকাটাকে নিয়ে চলে যাব নিজের বাসায়, সংসার আছে আমার, খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে তো... পোকাটা নিয়ে সবে ফুড়ুৎ করে উঠেছে, অমনি হতভাগা মাছ মিয়া, বোয়াল তোকে গিলে খাক, বেটা চেঁচিয়ে উঠল: 'বাজ! বাজ!' ভয়ে ডেকে উঠলাম আমি, অমনি কেঁচোটাও পড়ল জলে, আর মাছ মিয়া তাকে খেয়ে নিলে... এটা কি মিছে কথা হল?! বাজ-ফাজ কিছুই ছিল না...'

'আমি তো ঠাট্টা করেছিলাম,' কৈফিয়ৎ দিলে মাছ মিয়া। 'আর কেঁচোটা সত্যিই ছিল খুব মিষ্টি...'

মাছ মিয়ার কাছে জুটল যত রাজ্যের মাছ, শোনে আর হাসে। সত্যি পুরনো বন্ধুর সঙ্গে জবর রসিকতা করেছে মাছ মিয়া! আর চড়ুই বাবু যে তার সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে, সে তো আরো হাসির ব্যাপার। রুখে রুখে আসে, রুখে রুখে আসে, কিন্তু কিছুই করতে পারে না।

'আমার কেঁচো খেয়ে তুই পেট ফেটে মরবি!' গালাগালি দিলে চড়ুই বাবু, 'কেঁচো আমি আরেকটা খুঁজে বার করব... রাগ হচ্ছে এই জন্যে যে মাছ মিয়া আমায় ঠকাল, তার ওপর আবার হাসাহাসি। অথচ আমি ওকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আমার চালে... খাশা বন্ধু বটে, বলার কিছু নেই! এই তো ঝাড়ুদার ইয়াশা, সেও তাই বলবে... ওর সঙ্গেও তো আমি মিলেমিশে থাকি, মাঝে মাঝে এমনকি একসঙ্গেই চলে জলখাবার: ও খায়, আমি টুকরো-টাকরা কুড়াই।'

'দাঁড়া ভায়ারা,' ফতোয়া দিলে ঝাড়ুদার, 'ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হয়। শুধু আগে গা ধুয়ে নিই... ন্যায়মতো ব্যাপারটার বিচার করব আমি। আর তুই চড়ুই বাবু, এখন খানিকটা শান্ত হয়ে নে...'

'আমার নালিশ ন্যায্য, অশান্ত হবার আমার কী আছে!' চেঁচাল চড়ুই বাবু, 'শুধু আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারার প্রতিফল পাবে মাছ মিয়া...'

তীরে বসল ঝাড়ুদার, পাশে রাখল তার খাবার পুঁটুলি। হাত-মুখ ধুয়ে বললে:

'তা ভায়ারা, এইবার বিচার হবে — তুই মাছ মিয়া হলি মাছ, আর চড়ুই বাবু হলি পাখি। ঠিক কিনা?'

'ঠিক, ঠিক!' চেঁচাল মাছ, পাখি, সবাই।

'এবার পরের কথা! মাছের বাস জলে, আর পাখির বাস শূন্যে। ঠিক কিনা? আর কেঁচো, ধরো, থাকে মাটিতে। আচ্ছা, এইবার দ্যাখো...'

ঝাড়ুদার তার পুঁটলিটি খুলে পাথরের ওপর রাখলে একটুকরো কালো রুটি, এই তার দিবাহার। বললে:

'আর এই দ্যাখো। এটা কী? এটা রুটি। আমি এটা খেটে রোজগার করেছি, আমি এটা খাব। আমি যদি এটা খাই, তাহলে কারো রাগ হবার কথা নয়। মাছ আর

পাখিও খেতে চায়... তবে তোমাদের আছে নিজের নিজের খাবার। তাহলে ঝগড়া করার কী আছে? চড়ুই বাবু কেঁচো খুঁড়ে বার করেছে, তার মানে এটা তার রোজগার, তাহলে কেঁচোটা ওর...'

'মাপ করবেন কাকু,' পাখির জটলার মধ্যে থেকে শোনা গেল একটা মিহি গলা।

পাখিরা সরে গিয়ে পথ করে দিলে ধোয়া-মোছা কাদাখোঁচার। সরু সরু পায়ে ঝাড়ুদারের কাছে গিয়ে সে বললে:

'কথাটা ঠিক নয় কাকু।'

'কী ঠিক নয়?'

'মানে, কেঁচোটা যে আমি খুঁটে বার করেছি... ওই তো, জিজ্ঞেস করো-না হাঁসদের, ওরা দেখেছে। পাই আমি, আর চড়ুই ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়।'

মুশকিলে পড়ল ঝাড়ুদার। ব্যাপারটা যে অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে।

'সেকী?' নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বিড়বিড় করলে সে, 'এই চড়ুই বাবু, তুই তাহলে ধাপ্পা মারছিস?'

'আমি নই, মিছে কথা বলছে কাদাখোঁচা। হাঁসেদের সঙ্গে ও সাঁট করেছে...'

'ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে ভায়া... হুঁ... সত্যি! কেঁচোটা অবিশ্যি ধর্তব্য নয়, কিন্তু এই চুরি করাটা খারাপ জিনিস। আর যে চুরি করেছে, তাকে মিছে কথা বলতেই হবে... ঠিক কিনা? এ্যাঁ...'

'ঠিক কথা! ঠিক কথা!' ফের সবাই চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে, 'তাহলেও চড়ুই বাবু আর মাছ মিয়ার মামলাটা তুমি ফয়সালা করে দাও! ওদের মধ্যে কে ঠিক? দুজনেই চেঁচামেচি করেছে, দুজনেই ঝগড়া লাগিয়েছে, হুলুস্থুল বাধিয়েছে সবার মধ্যে।'

'কে ঠিক? হারে চড়ুই বাবু আর মাছ মিয়া, দুজনেই তোরা দুষ্টু দামাল! সত্যি দামাল। দুজনকেই আমি শাস্তি দেব, লোকে দেখুক... নে, মিটমাট করে নে বলছি, এক্ষুনি!'

'ঠিক কথা,' সবাই চেঁচাল একসঙ্গে, 'মিটমাট করে নিক...'

'আর ধোয়া-মোছা কাদাখোঁচা, কেঁচোর জন্যে যে খাটল, তাকে খাওয়াব আমার পাঁউরুটির টুকরো-টাকরা দিয়ে,' রায় দিলে ঝাড়ুদার, 'সবাই সন্তুষ্ট থাকবে...'

'চমৎকার!' আবার চিৎকার করল সবাই।

রুটিটার জন্যে হাত বাড়ালে ঝাড়ুদার, কিন্তু রুটি উধাও।

যখন সে বিচার চালাচ্ছিল, চড়ুই বাবু ততক্ষণে সেটি মেরে দেয়।

'ইস্, কী ছ্যাঁচোড়! ইস্, কী জোচ্চোর!' রেগে উঠল সমস্ত পাখি আর সমস্ত মাছ।

সবাই ধাওয়া করলে চোরের পেছনে। রুটির চাঙড়টা ছিল ভারি। চড়ুই বাবু তা নিয়ে বেশি দূর উড়ে যেতে পারে নি। তাকে সবাই পাকড়াও করলে নদীর ওপরেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোটো বড়ো সব পাখি।

শুরু হল সত্যিকারের হুড়োহুড়ি। সবাই প্রাণপণে ছোঁ মারে আর রুটির টুকরো পড়ে নদীতে। শেষে চাঙড়টাও পড়ে গেল জলে। সঙ্গে সঙ্গেই তা দখল করলে মাছেরা। শুরু হল মাছ আর পাখিদের মধ্যে সত্যিকারের লড়াই। রুটির চাঙড় থেকে খসে খসে পড়তে থাকে টুকরো, আর সেগুলো তারা খায়। এমন খাওয়া যে কিছুই বাকি রইল না চাঙড়টার। সবটা খাওয়ার পর ফিরল সবার, লজ্জা হল। গেল কিনা চোর চড়ুইকে ধরতে, আর নিজেরাই খেয়ে নিল চোরাই মাল।

আর ফুর্তিবাজ ঝাড়ুদার ইয়াশা ওদিকে নদীতীরে বসে দ্যাখে আর হাসে। মজাটা হল মন্দ নয়... সবাই পালাল তার কাছ থেকে, রইল একা ধোয়া-মোছা কাদাখোঁচা।

'ওদের সঙ্গে তুই-ও গেলি না যে?' জিজ্ঞেস করলে ঝাড়ুদার।

'আমিও উড়ে যেতাম কাকু, কিন্তু দেখতে বড়োসড়ো তো নই। ধাড়ী পাখিরা ঠোকরায়...'

'তা এই বরং ভালো কাদাখোঁচা। দুজনেই রইলাম না খেয়ে। বোঝা যাচ্ছে, এখনো তেমন খাটা হয় নি...'

তীরে এল আলিওনুশকা, ফুর্তিবাজ ঝাড়ুদার ইয়াশাকে জিজ্ঞেস করলে কী হয়েছিল। সেও হাসতে লাগল।

'ইস্, মাছ পাখি সবাই ওরা কী বোকা! আমি হলে পোকা রুটি সবই ভাগ করে দিতাম, কেউ হুজ্জুৎ করত না। এই তো চারটে আপেল আমি ভাগ করে দিয়েছিলাম সেদিন... চারটে আপেল এনে বাবা বললে: 'লিজা আর আমার মধ্যে আধাআধি ভাগ করে দে তো।' আমি তিন ভাগ করলাম: একটা বাবাকে। একটা লিজাকে, আর বাকি দুটো আমার।'

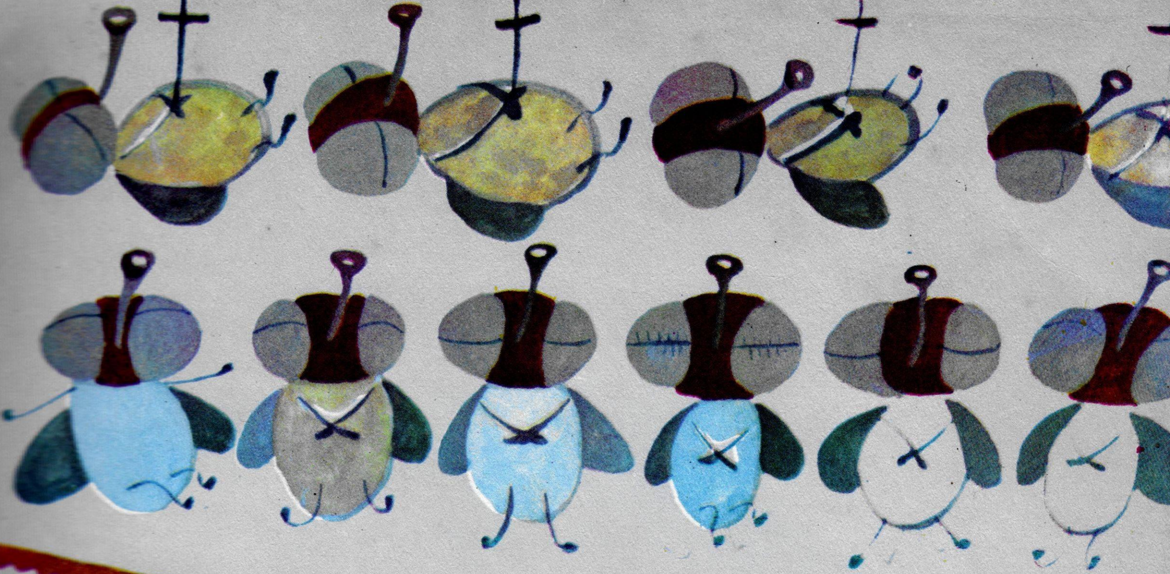

এক যে ছিল শেষের মাছিটি

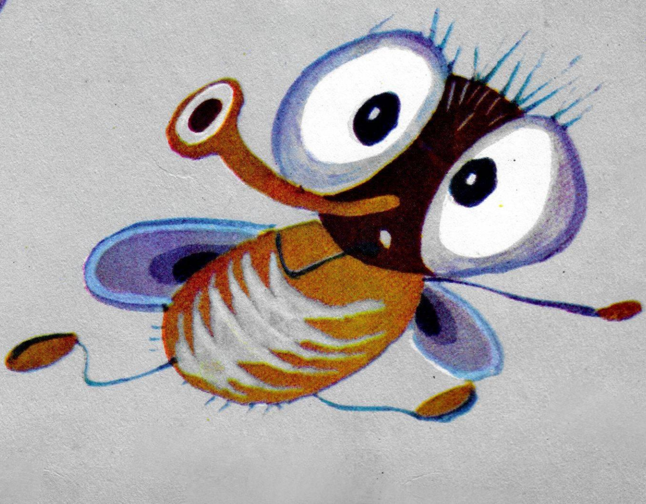

ভেবে দ্যাখো কী আরাম — পাঁচটা
কামরা আর
মাছি কেবল একটি!

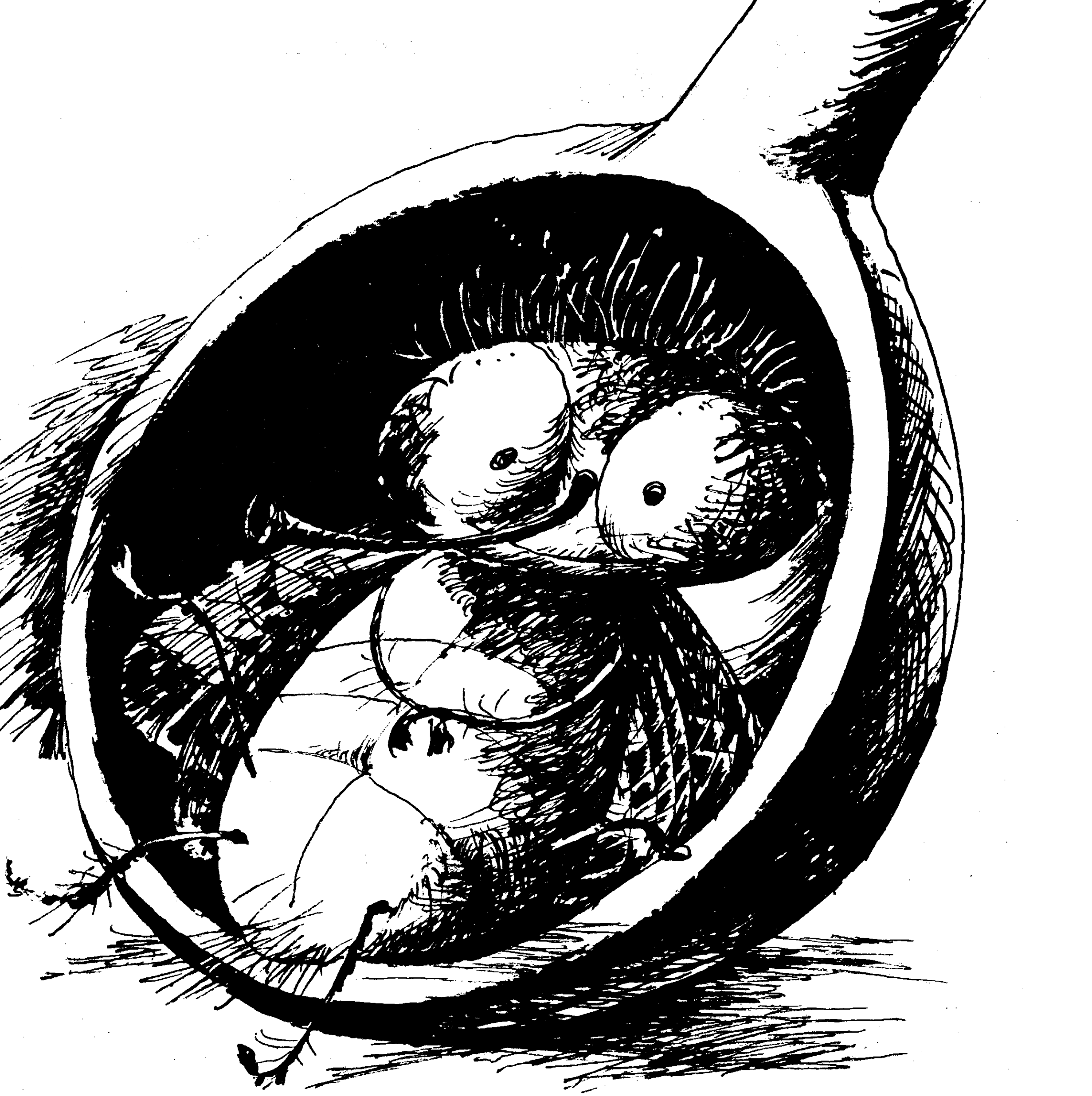

১

কী সুন্দর গ্রীষ্ম! ইস্, কী চমৎকার! আগাগোড়া সব গুছিয়ে বলাই কঠিন... মাছি কত — হাজার, হাজার। উড়ছে, ভনভন করছে, ফুর্তি লুটছে... ছোট্ট মুশকা মাছি যখন জন্মাল, টান টান করলে পাখনা, তারও ভারি আনন্দ হল। এত আনন্দ, এত আনন্দ যে বলার নয়। সবচেয়ে ভালো লাগত তার এইজন্যে যে সকালেই খুলে যেত বারান্দার সব দরজা জানলা — উড়ে যাও-না যে জানলায় খুশি।

'মানুষ কী সদাশয় প্রাণী।' জানলায় জানলায় উড়ে উড়ে অবাক লাগত তার। 'আমাদের জন্যে তারা জানলা করে দিয়েছে, সকালেও খোলে আমাদের জন্যেই। চমৎকার, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ফুর্তির ব্যাপার...'

হাজার বার সে উড়ে যায়, বাগানে গিয়ে বসে সবুজ ঘাসের ওপর, মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে ফুটন্ত ভায়োলেট, লাইম গাছের নরম পাতা, কেয়ারি-করা ফুলগাছ। এখনো পর্যন্ত বাগানের মালীকে সে চেনে না, অথচ সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে সে। আহ্, কী ভালোলোক এই মালী! ছোট্ট মুশকার জন্ম না হতেই তার জন্যে দরকারী সবকিছুই তৈরি। সেটা আশ্চর্য এই জন্যে যে সে নিজে উড়তে পারত না, এমনকি হাঁটতও মাঝে মাঝে খুবই কষ্টে, ভারি টলত। আর মালী কী সব বকবক করত কিছু বোঝা যেত না।

'কোত্থেকে যে এই হতচ্ছাড়া মাছিগুলো জোটে!' গজগজ করেছিল সদাশয় মালী।

সম্ভবত বেচারির হিংসে হচ্ছিল কারণ সে শুধু ভুঁই খুঁড়তে, ফুলের চারা বসাতে, গাছে জল দিতে পারে, কিন্তু উড়তে তো পারে না। ইচ্ছে করেই বাচ্চা মুশকা ভনভন করতে লাগল মালীর লাল নাকের ওপর, তিতিবিরক্তি ধরিয়ে দিল তার।

তাছাড়া, লোকে এত ভালো যে সবখানেই ঠিক মাছিদের জন্যেই নানারকম উপাদেয় জিনিসের ব্যবস্থা করে তারা। যেমন আলিওনুশকা, — সকালে দুধ খেল, রুটি খেল, ওলিয়া মাসির কাছে চাইল চিনি, এসবই সে করলে যাতে মাছিদের জন্যে কয়েক ফোঁটা দুধ, আর বড়ো কথা, রুটি আর চিনির ছিটেফোঁটা থেকে যায়। বলোই-না, সারা সকাল যখন উড়ে উড়ে ক্ষিদে পেয়ে যায়, তখন এর চেয়ে ভালো খাবার আর কী হতে পারে? আর রাঁধুনী পাশা তো আরো ভালো। ঠিক মাছিদের জন্যেই তিনি রোজ সকালে বাজার থেকে কিনে আনতেন ভারি সুস্বাদু সব জিনিস — মাংস, কখনো কখনো মাছ, নবনী, মাখন — সারা বাড়িতে সবচেয়ে দয়ালু। মাছিদের কী দরকার তা জানেন তিনি চমৎকার, যদিও মালীর মতোই তিনিও উড়তে পারেন না। মোটের ওপর ভারি সুন্দর লোক!

আর ওলিয়া মাসি? ওহ্, এই অপূর্বা নারীটি মনে হয় জন্মেছেন ঠিক মাছিদের জন্যেই... মাছিরা যাতে আনন্দে উড়তে পারে তার জন্যে রোজ সকালে তিনি সবকটি জানলা খুলে দিতেন নিজের হাতে। আর বৃষ্টি হলে বা ঠাণ্ডা পড়লে আবার তা বন্ধ করে দিতেন যাতে মাছিদের ডানা না ভেজে, সর্দি না লাগে। তাছাড়া ওলিয়া মাসি দেখেছেন, মাছিরা খুব ভালোবাসে ফল-পাকুড় আর চিনি। তাই তিনি রোজ চিনিতে সেদ্ধ করতেন ফলমূল। মাছিরা অবিশ্যি তক্ষুনি বুঝে যায় কার জন্যে এসব তৈরি হচ্ছে, তাই ধন্যবাদ সহকারে সোজাসুজি উড়ে আসে জ্যামের গামলায়। আলিওনুশকা খুবই ভালোবাসত জ্যাম, কিন্তু ওলিয়া মাসি তাকে দিতেন এক কি দু' চামচ, মাছিদের ভাগে কম পড়তে দিতেন না।

আর মাছিরা তো সবকিছু এক দফায় খেয়ে উঠতে পারে না, তাই কিছু কিছু জ্যাম ওলিয়া মাসি তুলে রাখতেন কাচের বয়ামে, ইঁদুরেরা যাতে না খায়, এ জিনিসটা তাদের একেবারেই খাওয়ার কথা নয়। তারপর চা খাওয়ার সময় তা রোজ জুটত মাছিদের ভাগে।

'আহ্, সবাই কী ভালো আর সদাশয়,' জানলায় জানলায় উড়ে উচ্ছ্বসিত হয়

ছোট্ট মুশকা, 'লোকেরা যে উড়তে পারে না, সে বরং ভালোই। তাহলে সবাই তারা হয়ে উঠত বড়ো বড়ো পেটুক মাছি। নিজেরাই খেয়ে ফেলত সব! ওহ্, কী সুন্দরই-না দুনিয়ায় বেঁচে থাকা!'

'আরে যা ভাবিস লোকে মোটেই তেমন ভালো নয়,' বললে বুড়ো মাছি, বকবক করতে ভালোবাসে সে, 'এ শুধু তোর মনে হচ্ছে... লোকে যাকে 'বাবা' বলে ডাকে, সে লোকটার দিকে নজর করেছিস?'

'সত্যি... ভদ্রলোকটি ভারি অদ্ভুত ধরনের। আপনি একেবারে সঠিক কথা বলেছেন মাছিবুড়ো... কেন সে পাইপ টানে যখন সে ভালোই জানে যে তামাকের ধোঁয়া আমার সহ্য হয় না? আমার ধারণা, এটা সে করে ইচ্ছে করে আমায় জ্বালাবার জন্যে... তাছাড়া মাছিদের এতটুকু উপকার করতে একেবারে নারাজ। যে কালিটা দিয়ে সে সারাক্ষণ কীসব লেখে, তা চেখে দেখতে গিয়ে আমি একবার প্রায় মরতে বসেছিলাম... একেবারে অসহ্য! নিজের চোখে দেখেছি, খুবই সুন্দর তবে নিতান্ত অনভিজ্ঞ দুটি মাছি ডুবে মরে তার দোয়াতের কালিতে। তারপর সে যখন কলম দিয়ে একটা মাছিকে তুলতে গিয়ে কাগজের ওপর খাশা একটি কালির ছোপ ফেলে, সে এক ভয়াবহ দৃশ্য... তাতে সে নিজের কোনো দোষ দেখল না, দোষ চাপাল আমাদের ওপর! কী অন্যায়!'

'আমার ধারণা, এই বাবাটার ন্যায়বোধ কিছুই নেই। তবে একটা গুণ তার আছে।' জবাব দিলে অভিজ্ঞ বুড়ো মাছি, 'দিবাহারের পর সে বিয়ার খায়। অভ্যেসটা মোটেই খারাপ নয়! আমিও বাপু, বিয়ার খেতে গররাজী নই তা বলেই রাখি, যদিও তাতে মাথা বোঁ-বোঁ করে... তা কী আর করা যাবে, বদভ্যাস করে রেখেছি!'

'আমিও বিয়ার ভালোবাসি,' কবুল করলে ছোকরা মুশকা, একটু লাল হয়েই উঠল, 'এতে ভারি ফুর্তি লাগে আমার, খুবই ফুর্তি, যদিও একটু মাথা ধরে পরের দিন। তবে মাছিদের জন্যে বাবা কিছুই যে করে না তার কারণ, সম্ভবত নিজে সে জ্যাম খায় না; আর চিনি মেশায় কেবল চায়ের গেলাশে। আমার মতে, যে জ্যাম খায় না, তার কাছ থেকে ভালো কিছুর আশা নেই... শুধু পাইপ টানা ছাড়া সে আর করবে-টা কী।'

মোটের ওপর সব লোককেই মাছিরা চিনত ভালো, তবে সবারই মত ছিল নিজের নিজের মতো।

২

গ্রীষ্মকালটা ছিল বেশ গরম, দিন দিনই বাড়তে লাগল মাছি। পড়ত তারা দুধে, স্যুপে, দোয়াতে, ভনভন করত, পাক খেত, পেছু লাগত সবারই। তবে আমাদের ছোট্ট মুশকা এর মধ্যে হয়ে উঠল রীতিমতো বড়োসড়ো, কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচে যায়। প্রথম বার তার পা আটকে যায় জ্যামে, কোনোরকমে ছাড়ায়; একবার আধঘুমে গিয়ে পড়েছিল জ্বলন্ত বাতির কাছে, একটুর জন্যে ডানা পোড়ে নি; তৃতীয় বার চাপা পড়তে যাচ্ছিল জানলার কপাটের ফাঁকে — মোটের ওপর, দুর্ঘটনা ঘটেছে অনেক।

'দ্যাখো দিকি, মাছিগুলোর জ্বালায় আর বাঁচা যায় না!' গজগজ করলে রাঁধুনী পাশা, 'একেবারে যেন ক্ষেপে গেছে, জুটছে সবখানে! এগুলোকে দূর করতে হয়।'

আমাদের মুশকা এখন বড়ো মাছি, তারও চোখে পড়ল, মাছির দল বড়ো বেশি, বিশেষ করে রান্নাঘরে। সন্ধ্যায় সিলিঙ ঢাকা পড়ে ঠিক যেন জীবন্ত, চলন্ত জালে। আর বাজার থেকে যখন খাবার-দাবার আসত, মাছিরা ঝাঁপিয়ে পড়ত ঝাঁক বেঁধে, ঠেলাঠেলি লাগাত, ঝগড়া বাধত প্রচণ্ড। সেরা ভাগ লুটত সবচেয়ে চটপটে আর তাকৎদারেরা, বাকিদের জুটত উচ্ছিষ্ট। ঠিক কথাই বলেছে পাশা।

কিন্তু এইসময় যা ঘটল, একেবারে ভয়ংকর। একদিন পাশা বাজার করে ফেরার সময় নিয়ে এল একতাড়া ভারি মিষ্টি কাগজ। মানে মিষ্টি হয়ে উঠল যখন তা ডিশে রেখে চিনি ছড়িয়ে ঢেলে দিলে গরম জল।

'এই হল মাছিদের খাশা খাবার', ডিশগুলো যাতে চট করে চোখে পড়ে, তেমন সব জায়গায় সাজিয়ে রেখে পাশা বললে।

পাশা তা না বললেও মাছিরা টের পেয়েছিল রান্নাটা তাদের জন্যেই। ফুর্তি করে ঝাঁক বেঁধে তারা নামল নতুন খাবারে। আমাদের এখনকার বড়ো মাছিও ছুটল একটা ডিশের দিকে, কিন্তু অন্য মাছিরা তাকে বেশ অসভ্যের মতোই ঠেলে ভাগালে।

অভিমান হল তার, 'ঠেলছ কেন মশাইরা? অন্যের কাছ থেকে কিছু কেড়ে খাব তেমন লোভী আমি নই। তাছাড়া এযে অভদ্রতা...'

তারপর যা ঘটল তা বলার নয়। সবচেয়ে লোভী মাছিরা পেঁছিল সবার আগে... প্রথমটা তারা হাঁটাহাঁটি করলে মাতালের মতো, তারপর একেবারেই টলে পড়ল।

সকাল বেলায় পাশা এক থালা মরা মাছি সাফ করলে। বেঁচে রইল কেবল সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরা। আমাদের বড়ো মাছিটিও তার একজন।

চিঁচিঁ করলে সবাই, 'ওসব কাগজে আমার দরকার নেই, চাই না...'

কিন্তু পরের দিনও ঘটল একই ব্যাপার। বুদ্ধিমান মাছিদের মধ্যে বেঁচে রইল কেবল সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরা। কিন্তু পাশার ধারণা হল, এই সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও অনেক।

'এদের জ্বালায় বাঁচা যায় না...' গজগজ করলে সে।

এখন, যে ভদ্রলোককে বাবা বলা হত, তিনি নিয়ে এলেন সুন্দর সুন্দর কাচের বাটি। তাতে বিয়ার ঢেলে রেখে দিলেন ডিশে ডিশে... অতিবুদ্ধিমানেরাও ধরা পড়ল তাতে। বোঝা গেল, এ বাটিগুলোও আসলে মাছি ধরার ফাঁদ। বিয়ারের গন্ধে মাছিরা সেখানে উড়ে গিয়ে মারা পড়ে, বেরুবার পথ পায় না।

'এইবার দিব্যি হয়েছে!' খুশি হয়ে উঠল পাশা; দেখা গেল, রাঁধুনীটার একেবারেই মায়াদয়া নেই, আনন্দ করে অন্যের দুঃখে।

এতে 'দিব্যি' হবার কী আছে। মাছিদের মতো মানুষেরও ডানা থাকলে আর বাড়ির মতো বড়ো বড়ো ফাঁদ পাতলে তারাও ঠিক অমনি ধরা পড়ত... এমনকি সবচেয়ে বুদ্ধিমান মাছিদের হাল দেখে লোকেদের ওপর বিশ্বাস একেবারেই চলে গেল আমাদের বড়ো মাছির। ওদের কেবল দেখেই মনে হয় ভালোমানুষ, আসলে সারা জীবনই ওরা চেষ্টা করে শুধু বেচারা সরল মাছিদের ঠকাতে। সত্যি কথা বলতে, এরা হল সবচেয়ে কুটিল আর হিংস্র প্রাণী!

এইসব কষ্টশষ্টে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল আমাদের মাছি, তখন আবার নতুন বিপদ। শোনা গেল, গ্রীষ্ম নাকি শেষ হয়ে গেছে। শুরু হল বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া, মোটের ওপর ভারি বিছছিরি আবহাওয়া।

যেসব মাছি তখনো বেঁচে ছিল, ভারি অবাক লাগল তাদের, 'সেকী, গ্রীষ্ম চলে গেল? এর মধ্যেই? সত্যিই এ ভারি অন্যায়... এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে দেখতে না দেখতেই হেমন্ত!'

বিষাক্ত কাগজ আর কাচের ফাঁদের চেয়েও এটা খারাপ। জঘন্য আবহাওয়াটা থেকে উদ্ধার কেবল ঝানু শত্রু মানুষের কাছেই। হায়, এখন আর জানলা খোলা হয় না

সারাটা দিনই। কালে-ভদ্রে একটু ফাঁক হয় শুধু। এমনকি সূর্যের আলোও যেন শুধু ঘরের সাদাসিধে মাছিগুলোকে জব্দ ফেলার জন্যে। যেমন, কার এটা ভালো লাগবে? সকাল বেলা, সূর্য উঠেছে, আনন্দে উঁকি মারছে জানলা দিয়ে, যেন মাছিদের ডাকছে বাগানে। মনে হবে আবার ফিরে এসেছে গ্রীষ্ম... কিন্তু দাঁড়াল কী, সাদাসিধে মাছিরা উড়ে গেল জানলা দিয়ে, সূর্য ওদিকে আলোই দেয়, গা আর গরম হয় না। আর ফিরে যখন এল, জানলা তখন বন্ধ। শুধু নিজেদের সরলতার দরুন অনেক মাছিই মারা গেল হেমন্তের ঠান্ডা রাতগুলোয়।

আমাদের বড়ো মাছি বললে, 'না, বিশ্বাস করি না। কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই... সূর্যও যদি ধাপ্পা দেয়, তাহলে কাকে, কীসে বিশ্বাস?'

হেমন্ত পড়তে সমস্ত মাছিরই যে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সে তো বোঝাই যায়। হঠাৎ বদলে গেল সবার স্বভাব। আগেকার আনন্দের আর চিহ্ন রইল না। সবাই হয়ে উঠল ভারি গোমড়া, এলিয়ে পড়া, খিটখিটে, কেউ কেউ এমনকি কামড়াতে শুরু করল, আগে কখনো যা হয় নি।

আমাদের বড়ো মাছিটির স্বভাব এমনই বিগড়ে গেল যে নিজেই সে চিনতে পারে না নিজেকে। যেমন, আগে অন্য কোনো মাছি মারা পড়লে কষ্ট হত তার, এখন সে ভাবে কেবল নিজেকে নিয়ে। মুখ ফুটে তার নিজের ভাবনার কথা বলতে গেলেও লজ্জা হত তার। যেমন সে ভাবত:

'মরুক গে ওরা, আমার ভাগে পড়বে বেশি।'

প্রথমত, সভ্যভব্য মাছির পক্ষে যেসব গরম কোণে শীত কাটানো সম্ভব, তা মোটেই তেমনি বেশি নয়, দ্বিতীয়ত, অরুচি ধরে গেছে অন্যান্য মাছিতে, সবখানে হানা দেয় তারা, নাকের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় টুকরো-টাকরা, ব্যবহার করে খুবই অভদ্রের মতো। বুড়ো বয়সে একটু বিশ্রামের তো দরকার।

অন্যান্য মাছিরা এই সব অমঙ্গল চিন্তা টের পেয়েই যেন মারা গেল শতে শতে। বলতে কি, ঠিক মারা গেল না, ঘুমিয়ে পড়ল। দিনে দিনে কমতে লাগল তাদের সংখ্যা, ফলে বিষাক্ত কাগজ বা মাছি ধরার কাচের ফাঁদ, কিছুরই দরকার রইল না। কিন্তু আমাদের মাছিটির মন উঠল না এতেও, তার ইচ্ছে, সে রইবে একেবারে একা। ভেবে দ্যাখো কী আরাম — পাঁচটা কামরা আর মাছি কেবল একটি!

৩

তেমন সুখের দিনও এল। সকালে আমাদের মাছিটির ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। অনেক দিন থেকেই কী যে একটা অবসাদ টের পাচ্ছিল সে, বোঝা যায় না, বসে থাকত চুল্লির কাছে নিজের কোণটিতে, নড়াচড়া করত না। আজ হঠাৎ সে টের পেল অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। জানলার কাছে উড়ে যেতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। এটা প্রথম তুষারপাত... শাদা চাদরে ঢেকে গেছে মাটি। 'বটে, তাহলে একেই বলে শীত!' মনে মনে ভাবল মাছি। ভালো একটুকরো মিছরির মতো ধবধবে শাদা...'

পরে আমাদের মাছিটি টের পেল যে অন্যান্য মাছিরা একেবারে নিঃশেষ হয়েছে। প্রথম শীত বেচারিরা সইতে পারে নি, ঘুমিয়ে পড়েছে যে যেখানে পারে। অন্য সময় এতে আমাদের মাছিটির কষ্ট হত, কিন্তু এখন সে ভাবলে:

'খাশা হয়েছে... এবার আমি একেবারে একলা! আমার জ্যাম, আমার চিনি, আমার টুকরো আর কেউ খাবে না। আহ্, চমৎকার!'

সবকটা কামরা সে উড়ে উড়ে পরিষ্কার বুঝল যে সত্যিই সে একলা। এবার যা খুশি তাই করা যায়। আর ভারি আনন্দের কথা যে ঘরের ভেতর এমন গরম! শীত, সে তো বাইরে, ঘরের ভেতর যেমন গরম তেমনি আরাম, বিশেষ করে সন্ধ্যায় যখন বাতি জ্বালায়। তবে প্রথম বাতিটার বেলায় খানিকটা বিপদ হয়েছিল, উড়ে গিয়ে সে আগুনে পড়ে মরতে বসেছিল।

ছ্যাঁকা খাওয়া পা মুছে সে ভাবলে, 'এটা নিশ্চয় শীতকালে মাছি ধরার ফাঁদ। উঁহু, আমায় তোমরা বাগাতে পারবে না... বেশ বুঝতে পারছি সব! শেষ মাছিটিকেও পুড়িয়ে মারতে চাও তোমরা? কিন্তু আমি সেটি মোটেই চাই না... রান্নাঘরে ওই যে, উনুনের ওই মুখটা — আমি কি আর বুঝি না যে ওটাও মাছি ধরার ফাঁদ!'

শেষ মাছিটি মনের সুখে ছিল কেবল দিন কয়েক, তারপর হঠাৎ তার এত মন খারাপ করতে লাগল যে বলার নয়। অবিশ্যি গরমেই ছিল সে। ভরপেট খাওয়া জুটত, কিন্তু তারপর, তারপর বড়ো একলা লাগতে লাগল তার। ওড়াউড়ি করে, খায়, জিরোয়, আবার ওড়ে, তারপর ফের মন খারাপ হয়ে যায় আগের চেয়েও বেশি।

ঘর থেকে ঘরে উড়তে উড়তে করুণ মিহি গলায় সে বললে, 'উহ্, কীযে বিছছিরি

লাগে! অন্তত আরো একটা মাছিও যদি থাকত, হোক সে সবচেয়ে পাজী, তাহলেও মাছি তো...'

সে যে একলা, এই নিয়ে শেষ মাছিটি যতই বিলাপ করুক, কেউ তাকে একেবারেই বুঝতে চাইল না। তাতে তার আরো রাগ হবে বৈকি, ক্ষেপার মতো সে লোকের পিছে লাগল। কারুর নাকে গিয়ে বসে, কারো কানে, কখনো চোখের সামনে আগুপিছু করে ওড়ে। মানে, একেবারে ক্ষেপা।

'ইস্, কেন আপনারা বুঝছেন না যে আমি একেবারে একা, খুবই বিছছিরি লাগছে আমার,' প্রত্যেকের কাছে পিঁপিঁ করত মাছি, 'তোমরা এমনকি উড়তেও পারো না, তাই জানো না ব্যাজার লাগা কী জিনিস। তোমাদের কেউ একজন আমার সঙ্গে একটু খেলতেও তো পারো... উঁহু, সে সাধ্যি থাকলে তো! মানুষের চেয়ে বেঢপ জরদ্গব আর আছে কে? এমন বিদঘুটে জীব আমি আর দেখি নি...'

কুকুর বেড়ালেও বিরক্তি ধরে গেল শেষ মাছিটির, বলতে কি সবেতেই। সবচেয়ে তার দুঃখ হয়েছিল যখন ওলিয়া মাসি বললে:

'আহা, শেষ মাছি... ওকে তোমরা কেউ মেরো না। গোটা শীতটা বেঁচেই থাকুক।'

সেকী? এযে সরাসরি অপমান। তাকে মাছি বলেই গণ্য করছে না। '' বেঁচে থাকুক', ভারি উপকার করলেন! আর আমার যদি ব্যাজার লাগে? আমার যদি-বা বাঁচার ইচ্ছেই না থাকে? নেই-ই তো!'

সবার ওপর এতই রেগে গেল শেষ মাছিটি যে নিজেরই তার ভয় লাগল। ওড়ে, বোঁ-বোঁ করে, পিঁপিঁ করে... শেষ পর্যন্ত কোণের মাকড়শাটার মায়া হল তার ওপর। বললে:

'ও মাছিগো, আয় আমার কাছে... কেমন সুন্দর আমার জাল!'

'অশেষ ধন্যবাদ... বন্ধু পেলেন বটে! সুন্দর ও জালটি কী চিজ তা আমার বেশ জানা আছে। নিশ্চয় তুই একসময় মানুষ ছিলি, এখন মাকড়শার বেশ ধরেছিস।'

'আমি যে আপনার মঙ্গল চাই।'

'হারে মুখপোড়াটা। শেষ মাছিটিকেও খাবি — একে বলে মঙ্গল চাওয়া!'

বেদম ঝগড়া করলে তারা, তাহলেও বড়ো একলা লাগছিল তার। এত একলা, এত একলা যে বলার নয়। একেবারে সবার ওপর আক্রোশে মন ভরে উঠল তার, হয়রান হয়ে গলা ফাটিয়ে বললে:

'এই যদি ব্যাপার, কীযে খারাপ লাগছে আমার তা যদি বুঝতেই না চাও, তাহলে এক কোণে গিয়ে বসে থাকব সারা শীতকালটা!.. তখন ঠেলা বুঝবে? হ্যাঁ, বসে থাকব, কিছুইতেই বেরুব না...'

গ্রীষ্মকালের আনন্দের কথা মনে পড়ে এমনকি কেঁদে ফেললে সে। ফুর্তিবাজ মাছি ছিল কত, আর তার কিনা ইচ্ছে হয়েছিল একেবারে একা থাকতে। এযে সর্বনাশা ভুল...

ওদিকে শীত চলেছে তো চলেছেই। শেষ মাছিটির মনে হল, গ্রীষ্ম আসবে না আর কখনোই। তার ইচ্ছে হল মরে। কাঁদলে খানিক। নিশ্চয় লোকেরাই এই শীতকালটা মাথা খাটিয়ে বার করেছে, কেননা মাছির পক্ষে যাকিছু অনিষ্টকর সবই ভেবে ভেবে বানায় তারা। নাকি ওলিয়া মাসির কাজ? চিনি আর জ্যাম যেমন লুকিয়ে রাখে, তেমনি করে গ্রীষ্মকে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও?

হতাশায় শেষ মাছিটি সত্যিই যখন মরতে রাজী, তখন ঘটল অসাধারণ একটা ব্যাপার। বরাবরের মতো সে তার কোণটিতে গুমরাচ্ছে, হঠাৎ শোনে বন-ন্-ন্-ন্! প্রথমটা সে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে নি। ভেবেছিল কারো তামাশা। আর তারপর — কী কাণ্ড! তার কাছ দিয়ে উড়ে গেল সত্যিকারের এক জীবন্ত মাছি, তখনো নিতান্ত ছোট্ট। সবে জন্ম হয়েছে, সবে মুখ দেখেছে আনন্দের।

'বসন্ত এসেছে! বসন্ত!' বনবন করে উঠল সে।

দুজন দুজনকে পেয়ে কী খুশি! কোলাকুলি করলে, চুমু খেলে, এমনকি শুঁড় দিয়ে চাটলে এ-ওকে। কয়েক দিন ধরে বুড়ো গল্প করে শোনাল, সারা শীতটা তার কী বিচ্ছিরি কেটেছে, একা কী ব্যাজার লেগেছে তার। মিহি গলায় হেসে উঠল বাচ্চা মাছি। কিছুতেই ভেবে পেল না কেমন করে ব্যাজার লাগতে পারে।

'বসন্ত! বসন্ত!' আবার বলে উঠল সে।

জানলা বন্ধ করা ব্যবস্থা যখন খুলে ফেলার হুকুম দিলে ওলিয়া মাসি, খোলা জানলা দিয়ে প্রথম তাকিয়ে দেখল আলিওনুশকা, তখন সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল শেষ মাছিটির কাছে।

'এবার আমি সব বুঝেছি,' চিঁচিঁ করে বললে শেষ মাছিটি, 'গ্রীষ্ম বানাই আমরা, মাছিরা...'

কালোমুণ্ডু কাক আর হলুদ-পরী ক্যানারি

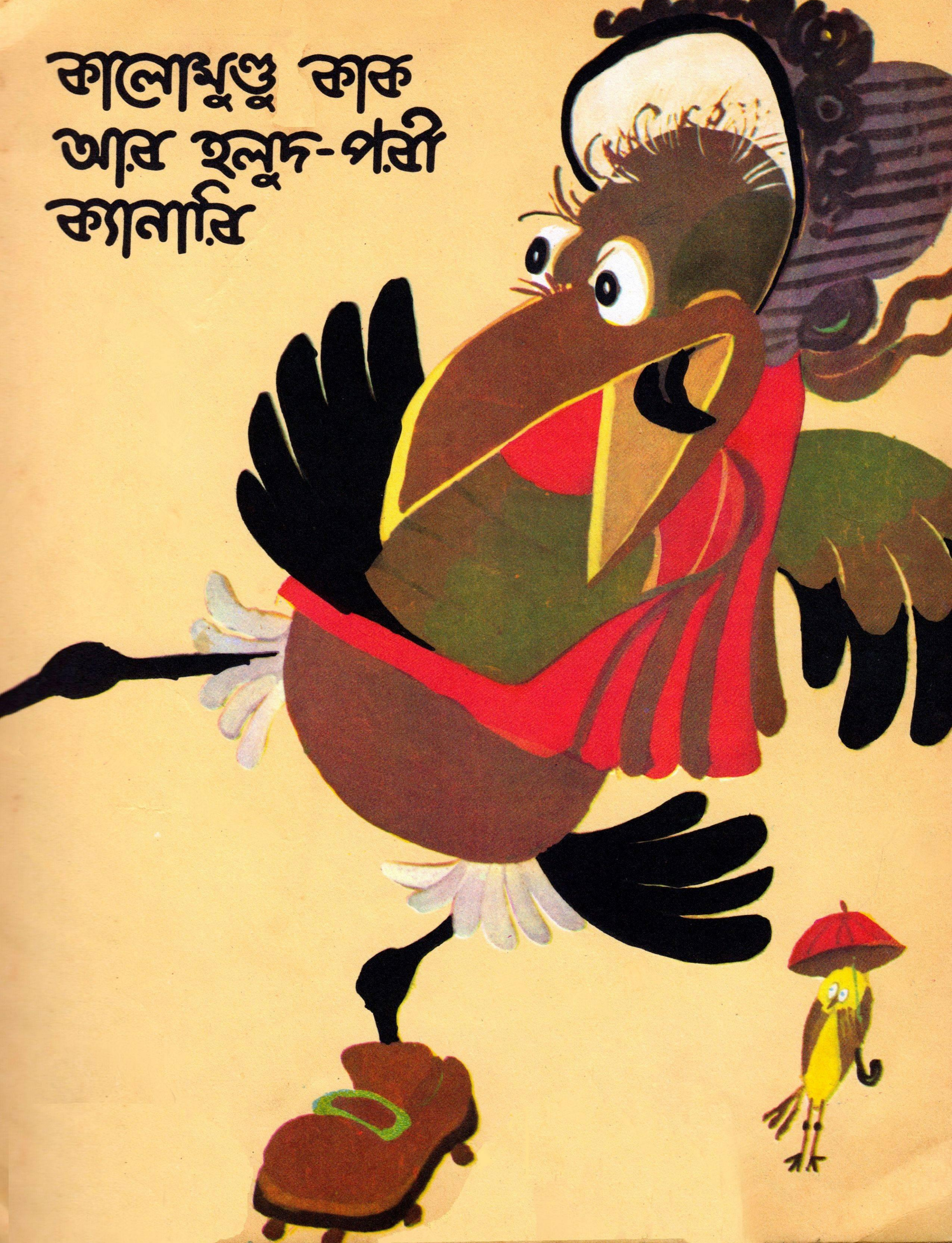

'এই হল গান!'

বার্চ গাছে বসে আছে কাক, নাক ঠোকে ডালে ডালে। নাকটি পরিষ্কার করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ডাক জুড়লে:

'কা-কা!'

বেড়ার ওপর ঢুলছিল ভাসকা বেড়াল, আরেকটু হলেই আঁতকে পড়ে যেত। শুরু করলে গজগজ:

'ধুত্তোরি কালোমুণ্ডু... কনে যে ভগবান গলা দেন অমন ক্যাঁককেঁকে! এত খুশি কিসের?'

'থাম তো! দেখছিস না সময় নেই আমার? উহু, একেবারে সময় নেই। কা-কা-কা... কেবল কাজ আর কাজ।'

'একেবারে জেরবার হয়ে গেছে বেচারি,' হেসে উঠল ভাসকা।

'চুপ কর, আলসে কোথাকার... সারা দিন ধরে গড়াচ্ছে, জানে কেবল রোদ পোয়াতে। আমার এদিকে সকাল থেকে শান্তি নেই। গণ্ডা গণ্ডা ছাদে গিয়ে বসেছি, ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি আধখানা শহর, সবকটা গলিঘুঁজিতে উ'কি দিয়েছি। এখনো ঘণ্টিঘরে ওঠা, বাজারে যাওয়া, সবজী ভুঁই খোঁড়া বাকি... তোর সঙ্গে কেবল মিছিমিছি সময় নষ্ট — ফুরসৎ নেই আমার। উহু, একেবারে ফুরসৎ নেই!'

শেষ বারের মতো ডালে নাক খোঁচালে কাক, গা ঝাড়া দিলে, ফুড়ুৎ করে উড়তে যাবে, হঠাৎ শোনে ভয়ংকর চেঁচামেচি। উড়ে আসছে এক ঝাঁক চড়ুই আর তাদের আগে হলদেটে একটি ছোট্ট পাখি।

'ধরো ভাইসকল... ধরো ওকে!' চিঁচিঁ করলে চড়ুইয়েরা।

'কী ব্যাপার? যাচ্ছো কোথায়?' চেঁচিয়ে বললে কাক।

বার দশেক ডানা নাড়তেই কাক গিয়ে পেঁছিল চড়ুইয়ের ঝাঁকে। হলুদ পাখিটির সব শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল, নেমে পড়ল একটা বাগানে, সেখানে লাইল্যাক, ক্যারেন্ট, বার্ড-চেরির ঝোপ। ভেবেছিল চড়ুইগুলোর কাছ থেকে লুকিয়ে পড়বে। হলদে পাখিটা ঝোপের তলে ঢুকতেই কাক এসে হাজির।

'তুই কে?' কা-কা করে উঠল কাক।

চড়ুইরা ঝোপটাকে একেবারে ছেঁকে ধরল, মনে হবে যেন একমুঠো মটর-কলাই ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ।

হলুদ পাখিটির ওপর তাদের প্রচন্ড আক্রোশ, চাইছিল তাকে ঠোকরাতে।

'ওর ওপর তোমাদের এত রাগ কেন?' জিজ্ঞেস করলে কাক।

'কেন ওর রঙ হলদে?' সমস্বরে কিচিরমিচির করে উঠল সবকটা চড়ুই।

হলুদ পাখিটার দিকে তাকিয়ে দেখল কাক: সত্যিই একেবারে হলদে। মাথা নেড়ে বললে:

'যত সব লক্ষ্মীছাড়ার দল! এটা যে পাখিই নয়! পাখি কি আর এরকম হয়? যাও গে, সরে যাক তো সবাই... এই আজব চীজটার সঙ্গে আমায় কথা কইতে হবে। ও শুধু পাখির ভান করছে...'

চড়ুইগুলো কিচিরমিচির করলে, রেগে উঠল আরো, তবে করবার কিছু নেই, যেতে হয়। কাকের সঙ্গে তো আর ইয়ার্কি চলে না। নাকটি দিয়ে চেপে চেপে ধরলেই দফা শেষ।

চড়ুইদের তাড়িয়ে দিয়ে কাক পড়ল হলদে পাখিটাকে নিয়ে। ভারি হাঁপাচ্ছিল পাখিটা, কালো কালো চোখে করুণ চাউনি।

'কে তুই?' জিজ্ঞেস করলে কাক।

'আমি ক্যানারি পাখি...'

'দেখিস, চালাকি মারিস না। তাহলে মজা টের পাবি কিন্তু। আমি না থাকলে তো চড়ুইগুলো তোকে ঠুকরেই শেষ করত...'

'সত্যি বলছি, আমি ক্যানারি...'

'এলি কোত্থেকে?'

'আমি থাকতাম খাঁচায়... খাঁচাতেই আমার জন্ম। সেখানেই বেড়ে উঠেছি, থাকি সেখানেই। ইচ্ছে হয়েছিল, অন্য পাখিদের মতো আমিও উড়ব। খাঁচাটা ছিল জানলায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম অন্য পাখিদের... কী ফুর্তি ওদের। এদিকে আমার খাঁচাটা বড়ো ছোটো। আলিওনুশকা খুকি এক পেয়ালা জল এনে খাঁচার দরজাটা খুলতেই আমি ঝট করে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমটা ঘরখানায় অনেক উড়লাম, তারপর বেরিয়ে পড়লাম জানলা দিয়ে।'

'খাঁচায় কী করতিস তুই?'

'আমি যে ভালো গাইতে পারি...'

'নে, গেয়ে শোনা তো।'

গান গাইলে ক্যানারি। মাথাটা কাত করে শুনে ভারি অবাক লাগল কাকের।

'একে তুই বলিস গান? হা-হা-হা... এমন গানের জন্যে তোকে খাওয়াত মনিব? একেবারে বোকা। খাওয়াতে হলে খাওয়ানো দরকার সত্যিকারের পাখিকে। যেমন আমি... একবার গলা খাঁকারি দিতেই পাজী ভাসকাটা বেড়া থেকে উলটে পড়তে যাচ্ছিল। এই হল গান!'

'ভাসকাকে আমি চিনি... ভয়ংকর জানোয়ার। কতবার এসেছে আমাদের খাঁচার কাছে। সবুজ চোখ যেন জ্বলে, নখ বার করে থাবা থেকে...'

'তা কারো কাছে ভয়ংকর, কারো কাছে নয়... তবে ওটা যে মহা পাজী তাতে সন্দেহ নেই। তবে ও নিয়ে কথা হবে পরে... আর যতই বল আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না তুই সত্যিকারের পাখি...'

'সত্যি বলছি মাসি, পাখি, একদম পাখি। সমস্ত ক্যানারিই পাখি...'

'হয়েছে, হয়েছে, সে দেখা যাবে... কিন্তু থাকবি কী করে?'

'আমার খাওয়ায় বেশি লাগে না; কিছুটা দানা, একটুকরো চিনি, শুখা রুটি — বাস, তাতেই পেট ভরে যায়।'

'ইস, একেবারে নবাবজাদী! চিনি ছাড়াও চলবে। আর দানা কোনোরকমে জোগাড় হবে। মোটের ওপর তোকে ভালোই লাগল আমার। থাকবি আমার সঙ্গে? বার্চ গাছে আমার বাসা আছে চমৎকার...'

'ধন্যবাদ। তবে ওই চড়ুইগুলো...'

'আমার কাছে থাকলে তোর ওপর আঙুল তুলতেও কেউ সাহস পাবে না। শুধু চড়ুইরা নয়, পাজী ভাসকাটাও জানে আমার চরিত্তির। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি নয়...'

সঙ্গে সঙ্গেই খুশি উঠল ক্যানারি, উড়ে গেল কাকের সঙ্গে। তা বাসাটা চমৎকারই বটে, শুধু খানিকটা শুখা রুটি আর চিনি হলে বেশ হত...

কাক আর ক্যানারি এক বাসাতেই দিন কাটাতে লাগল। মাঝে মাঝে একটু গজগজ করতে ভালোবাসত কাক, তবে পাখি সে খারাপ নয়। চরিত্রে তার শুধু একটা দোষ, সবার ওপরেই তার হিংসে, ভাবত সবাই তার ওপর অন্যায় করেছে।

'হাঁদা মুরগীগুলো আমার চেয়ে ভালোটা কিসে? অথচ লোকে ওদের খাওয়ায়, যত্ন-আত্তি করে,' ক্যানারির কাছে নালিশ করত সে, 'তারপর ওই পায়রাগুলো... কী ফয়দা ওদের কাছ থেকে, অথচ থেকে থেকেই মুঠো ভরে যব ছড়িয়ে দেবে ওদের জন্যে। ওগুলোও হাঁদারাম পাখি। আর আমি একটু উড়ে গেলেই ঘাড় ধরে সবাই তাড়িয়ে দিতে ছুটে আসে। এটা কি ন্যায় হল? তার ওপর গালাগালি: 'হতচ্ছাড়া কাক!' আর তুই নজর করেছিস, আমি অন্যদের চেয়ে ভালো, দেখতেও সুন্দর? মানলাম যে নিজের সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলতে নেই, কিন্তু বলাচ্ছে যে। বল, সত্যি নয়?'

সব কথাতেই সায় দিত ক্যানারি:

'হ্যাঁ, তুমি বড়োসড়ো পাখি...'.

'সে তো ঠিক কথা। লোকে টিয়া পোষে খাঁচায়, কত তার যত্ন। কিন্তু আমার চেয়ে টিয়া ভালো হল কিসে? একেবারে বোকা পাখি। জানে শুধু চেঁচাতে আর বিড়বিড় করতে, আর কী যে বলছে কারো বোঝার সাধ্যি নেই। ঠিক বলছি না?'

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেও টিয়া ছিল। ভয়ানক বিরক্তি ধরে গিয়েছিল সবার।'

'আরো পাখি যে কত, আর কেন যে তারা বেঁচে থাকে কে জানে! যেমন স্টার্লিং, কে জানে কোত্থেকে উড়ে আসে পাগলার মতো, গ্রীষ্মকালটি কাটায়, তারপর ফের উধাও। ভরত পাখিগুলোও তাই, টমটিট, নাইটিঙ্গেল — এসব ওঁছাগুলো কি কম। এদের একটাও সত্যিকারের গুরুগম্ভীর পাখি নয়... যেই শীতের আমেজ দেবে অমনি সবাই যেদিকে দু'চোখ যায়, পিটটান।'

আসলে কাক আর ক্যানারি কেউ কাউকে বুঝত না। ক্যানারির পক্ষে বোঝা ভার স্বাধীন থাকা কী, আর কাক জানত না খাঁচার জীবন।

'আচ্ছা মাসি, সত্যিই তোমায় কেউ কখনো দানা দেয় নি?' অবাক লাগত ক্যানারির, 'মানে, অন্তত একটা দানা?'

'কী বোকা তুই... দানা কোথায়? লাঠি পেটা করে কি ঢিল ছুঁড়ে না মারলেই রক্ষে। মানুষেরা ভারি হিংস্র...'

এই শেষ কথাটায় ক্যানারি সায় দিতে পারল না কিছুতেই, কেননা মানুষেরাই তাকে খাইয়েছে। কাকের হয়ত ওটা ভুল ধারণা... তবে মানুষ যে হিংস্র, শিগগিরই সেটা নিজেই দেখল ক্যানারি। একদিন বসে ছিল বেড়ার ওপর, হঠাৎ শোঁ করে ঠিক মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা বড়ো ঢেলা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল স্কুলের ছেলেপিলেরা। বেড়ার ওপর কাক দেখে ঢিল না ছুঁড়ে তারা পারে?

'কী, এবার দেখলি তো?' চালে গিয়ে বসে জিজ্ঞেস করলে কাক, 'সবাই ওরা, মানে লোকেরা ওই একই রকম।'

'হয়ত তুমি ওদের কোনো ক্ষতি করেছ মাসি?'

'এতটুকু না... এটা ওদের স্রেফ রাগ। আমায় ওরা একেবারে দেখতে পারে না...'

বেচারি কাকের জন্যে কষ্ট হল ক্যানারির, কেউ, কেউই তাকে ভালোবাসে না। এভাবে যে বাঁচা চলে না...

মোটের ওপর শত্রু ছিল অনেক। যেমন ওই হুলো ভাসকাটা... কী মোলায়েম চোখে সে চাইত পাখিদের দিকে, ভাব করত যেন ঘুমুচ্ছে, অথচ স্বচক্ষে ক্যানারি দেখেছে কেমন করে সে আনাড়ী একটা ছোট্ট চড়ুইকে শিকার করে, শুধু মড়মড় শব্দ উঠল হাড় চিবানোর, উড়ে গেল পালকগুলো, বাস্... কী ভয়ংকর! তারপর বাজপাখি — ইনিও কম যান না। ভেসে থাকে বাতাসে, তারপর হঠাৎ শোঁ করে ঢিলের মতো এসে পড়ে কোনো আনমনা পাখির ওপর। মুরগীর বাচ্চাকে বাজ কীভাবে চুরি করেছে, তাও দেখেছে ক্যানারি। তবে বেড়াল, বাজ, কাকেও ভয় করত না কাক, ছোটোখাটো কোনো পাখি পেলে নিজেই একটু ভোজন দিতে আপত্তি হত না তার। স্বচক্ষে তা দেখার আগে পর্যন্ত ক্যানারির তা বিশ্বাস হয় নি। একবার সে দেখলে ঝাঁক

বেঁধে চড়ুইয়ের দল তাড়া করছে কাককে। উড়ছে, কিচিরমিচির করছে... ভয়ানক ভয় পেয়ে বাসার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ক্যানারি।

'ফেরত দে, ফেরত দে!' কাকের বাসার ওপর উড়তে উড়তে প্রচণ্ড চিঁচিঁ করছিল চড়ুইয়েরা, 'এসব কী? এযে ডাকাতি!'

ঝুপ করে নিজের বাসায় এসে পড়ল কাক, আর সভয়ে ক্যানারি দেখলে যে তার নখে বিঁধে আছে রক্তমাখা একটা মরা চড়ুই ছানা।

'কী করছ গো মাসি?'

'চুপ করে থাক...' হিসিয়ে উঠল কাক।

চোখ তার ভয়ংকর, জ্বলজ্বল করছে... ভয়ে চোখ বুজল ক্যানারি। বেচারা চড়ুই ছানাটাকে কাক ছিঁড়ে খাবে, সেটা যাতে দেখতে না হয়।

ভাবলে, 'অমনি করে আমাকেও কোনো দিন খেয়ে ফেলবে যে।'

কিন্তু পেটে কিছু পরার পরে কাকের মেজাজ হত দিলদরিয়া। নাকটি মুছে কোনো একটা ডালে গুছিয়ে বসে আমেজে ঢুলত। মোটের ওপর ক্যানারি লক্ষ্য করল যে মাসিটি বেজায় পেটুক, কিছুতেই তার অরুচি নেই। কখনো টেনে আনত পাঁউরুটির চটা, কখনো একটুকরো পচা মাংস, কখনো-বা কীসব উচ্ছিষ্ট, খুঁটে আনত আঁস্তাকুড় থেকে। এইটেই ছিল কাকের পেয়ারের কাজ। আঁস্তাকুড় খোঁটায় কেন যে অত তৃপ্তি, সেটা বুঝে পেত না ক্যানারি। তবে কাককেও বড়ো একটা দোষ দেওয়া যায় না। রোজ সে খেত বিশটা ক্যানারির খাবার। তার সবকিছু ভাবনা কেবল খাওয়া নিয়ে... চালে কোথাও বসে চারিদিক নজর করে দেখত।

নিজে খাবার খুঁজতে আলিস্যি লাগলে সে চালাকি করত। চোখে পড়ল, কিছু একটা টানছে চড়ুইয়েরা, অমনি ছোঁ। যেন উড়ে যাবে পাশ দিয়ে, অথচ চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে:

'ইস্, এতটুকু সময় নেই আমার... একেবারে সময় নেই!'

শিকারটি ছিনিয়ে এনে, বাস্ চুপচাপ।

'অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, সেটা ভালো নয় মাসি,' অস্বস্তিতে একদিন বললে ক্যানারি।

'ভালো নয়? আর আমার যদি কেবলি ক্ষিদে পায়?'

'অন্যেরাও তো খেতে চায়...'

'অন্যেরা সবাই নিজেরাই নিজেকে দেখে। কেবল তোদের, ননীর পুতুলদের খাঁচায় রেখে খাওয়ায়, আর আমাদের খাওয়া জোটাতে হয় নিজেদেরই। তাছাড়া তোর কি চড়ুইদের কতটা লাগে? কয়েকটা দানা খুঁটে খেলেই সারা দিনের মতো পেট ভরা।'

দেখতে না দেখতে কেটে গেল গ্রীষ্ম। সূর্য হয়ে এল নিস্তেজ, দিনগুলো ছোটো। শুরু হল বৃষ্টি, হাওয়া দিল ঠাণ্ডা। ক্যানারির মনে হত বড়ো সে অভাগা, বিশেষ করে যখন বৃষ্টি পড়ত। কাকের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

'বৃষ্টি পড়ছে তাতে হলটা কী,' অবাক লাগত তার, 'পড়ছে-পড়ছে, তারপর থেমে যাবে।'

'কিন্তু ঠাণ্ডা যে মাসি! উঃ, কী ঠাণ্ডা!'

সবচেয়ে বিছছিরি লাগত রাতে। ভেজা গায়ে কাঁপত ক্যানারি আর রাগারাগি করত কাক:

'ননীর পুতুল! এখনই হয়েছে কী, শীতকালে যখন বরফ পড়বে, তখন দেখবি।'

কাকের এমনকি রাগই হত। ঝড় বৃষ্টি ঠাণ্ডায় ভয় পায়, সে আবার কেমন পাখি? দীনদুনিয়ায় এভাবে তো বাঁচা যায় না। আবার তার সন্দেহ হল ক্যানারিটা সত্যিই পাখি কিনা। সম্ভবত পাখির ভান করছে...

'সত্যিই মাসি, আমি খাঁটি পাখি,' সজল চোখে বললে ক্যানারি, 'কেবল বড়ো ঠাণ্ডা লাগে আমার...'

'দেখিস বাপু! আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুই একটা ভেকধারী পাখি...'

'না, না, সত্যি কোনো ভান করছি না।'

মাঝে মাঝে নিজের ভাগ্য নিয়ে খুবই ভাবত ক্যানারি। তা, খাঁচায় থাকলেই বরং ভালো হত... দিব্যি গরম, খাবারেরও ভাবনা নেই। যে জানলায় তার খাঁচাটা ছিল, বার কয়েক সেখানে সে উড়েও গেল। নতুন দুটি ক্যানারি সেখানে, তাকে দেখে হিংসে হচ্ছিল তাদের।

শীতে জমা ক্যানারি করুণ স্বরে মিনতি করলে, 'উঃ, কী ঠাণ্ডা... ভেতরে যেতে দাও আমায়।'

একদিন সকালে কাকের বাসা থেকে ক্যানারি দেখলে এক অদ্ভুত মনমরা দৃশ্য: রাতের ভেতর মাটি ঢেকে গেছে প্রথম তুষারকণায়, যেন মড়াঢাকা চাদর। চারিদিকই শাদা... সবচেয়ে বড়ো কথা, যেসব দানা খুঁটে ক্যানারি খেত, তা সবই ছেয়ে গেছে বরফে। আছে কেবল অ্যাশবেরি। কিন্তু এই টক বৈঁচিগুলো তার রুচত না। কাক ওদিকে বসে বসে অ্যাশবেরি ঠুকরে তারিফ করে চলেছে:

'আহ্, চমৎকার বৈঁচি!'

দিন দুয়েক উপোস দিয়ে ক্যানারি একেবারে হতাশ হয়ে উঠল। কী হবে এর পর? না খেয়েই যে মরতে হবে...

বসে বসে দুঃখ করছে ক্যানারি। হঠাৎ দ্যাখে বাগানে ছুটে আসছে স্কুলের ছেলেরা, সেই যারা ঢিল ছুঁড়েছিল কাকের দিকে। মাটিতে জাল বিছিয়ে মিষ্টি শণের বিচি ছড়িয়ে চলে গেল।

'সত্যি, ছেলেগুলো মোটেই খারাপ নয়,' বিছানো জালটার দিকে চেয়ে খুশি হয়ে উঠল ক্যানারি, 'ও মাসি, ছেলেরা আমায় খাবার দিয়ে গেছে!'

'খাশা খাবার, বলবার কিছু নেই!' গজগজ করলে কাক, 'ওখানে নাক গলাবার কথা মনেও ঠাঁই দিবি না, বুঝেছিস? দানা ঠোকরাতে গেলেই আটকা পড়বি জালে।'

'তারপর কী হবে?'

'ফের তোকে পুরবে খাঁচায়...'

ক্যানারির ভাবনা হল: খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার খাঁচায় ঢুকতেও মন সরছে না। এখানে অবিশ্যি ঠান্ডা, খাবারও নেই, তাহলেও স্বাধীনভাবে থাকা কত ভালো, বিশেষ করে যখন বৃষ্টি পড়ে না।

দিন কয়েক মন শক্ত করে রইল ক্যানারি, কিন্তু ক্ষিদে তো আর মানা মানে না, লোভানিতে ভুলল সে, পা দিল ফাঁদে।

'বাঁচাও, বাঁচাও!' করুণ স্বরে চিঁ-চিঁ করল সে, 'আর কখনো করব না... ফের খাঁচায় ঢোকার চেয়ে বরং না খেয়ে মরা ভালো!'

ক্যানারির এখন মনে হল দুনিয়ায় কাকের বাসার চেয়ে সেরা আর কিছু নেই। মানে, ক্ষিদের কষ্ট, ঠান্ডা, এসব ছিল বটে, তবে স্বাধীনতা ছিল অপার। যেখানে খুশি যাও-না উড়ে... এমনকি কেঁদেই ফেলল সে। ছেলেগুলো এইবার এসে তাকে ফের

পুরবে খাঁচায়। তবে সুখের কথা, কাক উড়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, দেখলে ব্যাপার খারাপ।

'আরে হাঁদা কে থাকার!' গজগজ করলে সে, 'আমি যে তোকে বলেছিলাম, টোপ গিলিস না।'

'আর কখনো করব না মাসি...'

ঠিক সময়েই এসেছিল কাক। শিকার ধরার জন্যে ছেলেগুলো দৌড়ে আসতে না আসতেই সে মিহি জালটাকে ছিঁড়ে ফেলেছিল, ফের স্বাধীন হল ক্যানারি। হতচ্ছাড়া কাকের পেছু অনেকখন তাড়া করেছিল ছেলেগুলো, লাঠি আর ঢিল ছুঁড়েছিল গালাগালি দিয়ে।

'আহ্, কী আরাম!' নিজের বাসায় ফিরে খুশি হয়ে উঠল ক্যানারি।

'আরাম তো বটেই। হুঁশিয়ার থাকিস...' গজগজ করলে কাক।

কাকের বাসায় দিন কাটাতে লাগল ক্যানারি, শীতের কষ্ট, ক্ষিদের কষ্টের কথা আর তুলত না। একদিন কাক খাবারের সন্ধানে উড়ে গেল, রাত কাটাল মাঠে, ফিরে দ্যাখে, পা উঁচিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্যানারি। মাথা কাত করে তার দিকে চেয়ে দেখে কাক বললে:

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, এটা পাখি নয়!'

সবার চেয়ে বুদ্ধিমান

'আমি তো সবার চেয়ে বুদ্ধিমান,
তাই না?'

১

তখনো ফরসা হয় নি, বরাবরের মতো সবার আগে ঘুম থেকে উঠে টার্কি মোরগ বৌকে জাগিয়ে বললে:

'আমি তো সবার চেয়ে বুদ্ধিমান, তাই না?'

ঘুমের ঘোরে অনেকখন কাশলে টার্কিগিন্নি, তারপর বললে:

'হ্যাঁ, ভারি বুদ্ধিমান... খক্-খক্... কে তা না জানে? খক্...'

'না, তুমি সোজাসুজি বলো: সবার চেয়ে বুদ্ধিমান? এমনিতে বুদ্ধিমান পাখি আছে ঢের। কিন্তু সবার চেয়ে বুদ্ধিমান — সে কেবল আমি।'

'সবার চেয়ে বুদ্ধিমান... খক্। বুদ্ধিমান সবার চেয়ে... খক্-খক্-খুক!'

'ঠিক।'

টার্কি মোরগ যেন খানিকটা রেগেই উঠল, গলা চড়াল যাতে অন্য পাখিরাও তাকে শুনতে পায়:

'জানো, আমার মনে হচ্ছে আমায় তেমন কেউ মান্যি করে না। হ্যাঁ, খুবই কম সম্মান দেখায়।'

'না, না, ও তোমার ভুল ধারণা... খক্-খক্!' রাতে এলোমেলো হয়ে যাওয়া পালকগুলো ঠিক করতে করতে সান্ত্বনা দিলে গিন্নি, 'হ্যাঁ, ও তোমার ভুল ধারণা... তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান পাখি আর ভাবা যায় না। খক্-খক্-খক্!'

'আর হাঁস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব বুঝি... মানলাম, এমনিতে সে সোজাসুজি কিছু বলে না, বেশির ভাগ চুপ করে থাকে। কিন্তু টের তো পাই, ওই কথা না বলে মনে মনেই সে আমায় অমান্য করে...'

'ও নিয়ে ভেবো না। মানে হয় না কোনো... খক্-খক্! আর তুমি খেয়াল করেছ যে হাঁস একটু বোকাটে?'

'কে না জানে? ওর মুখের ওপরেই লেখা আছে — বোকা হাঁস, বাস্। তা হাঁস তেমন একটা কিছু না, যে পাখি বোকাই, তার ওপর কি আর রাগ করা সাজে? কিন্তু ওই মোরগটা, সাধারণ মোরগ... তিন দিনের দিনই কী সে বলেছিল আমার নামে। চেঁচিয়ে বলেছিল যাতে সবাই শুনতে পায়। আমায় সে বলেছিল এমনকি হাঁদারাম... মানে এই ধরনের কিছু।'

'আশ্চর্য লোক তুমি!' অবাক হল গিন্নি, 'কেন সে চেঁচায় তা কি জানো না?'

'কেন?'

'খক্-খক্-খক্... খুবই সহজ কথা, সবাই জানে। তুমিও মোরগ, সেও মোরগ — শুধু ওটা নেহাৎ সাধারণ, মামুলী, আর তুমি হলে সাগরপারের মোরগ, রেড-ইন্ডিয়ান। তাই চিল্লায় আর হিংসে করে। সব পাখিই হতে চায় রেড-ইন্ডিয়ান টার্কি... খক্-খক্-খক্!'

'তবে সেটি হওয়া কঠিন গো গিন্নি... হা-হা-হা। ইস্, কী শখ! সাধারণ কোনো একটা মোরগ হলেও নয় কথা ছিল — হঠাৎ হতে চায় কিনা রেড-ইন্ডিয়ান মোরগ। না বাপু, ফাজলামি রাখো! টার্কি সে কখনোই হবে না।'

টার্কিগিন্নি ছিল ভারি ভালোমানুষ নিরীহ পাখি, কেবলি তার দুঃখ হত যে টার্কি কারো না কারো সঙ্গে ঝগড়া পাকাচ্ছে। যেমন আজকে, ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই ঠিক করেছে কারো সঙ্গে কোঁদল কি মারামারি বাধাবে। মানে ঠিক হিংস্র না হলেও সবচেয়ে ছটফটে পাখি। অন্য পাখিরা যখন টার্কিকে নিয়ে হাসাহাসি করে, তাকে বলে কথার জাহাজ, ঢঙী, তখন গিন্নির আঁতে ঘা লাগে বৈকি। নয় মানলাম যে তাদের কথায় খানিকটা সত্যি আছে, কিন্তু খুঁত নেই এমন পাখি কোথায়? এই হল কথা! তেমন পাখি নেই, আর অন্য কোনো পাখির ছোট্ট একটু খুঁত খুঁজে পেলেও আনন্দই হয় তো।

ঘুম ভেঙে পাখিরা মুরগীখামার থেকে বেরিয়ে এল আঙিনায়, সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল মহা হৈচৈ। সবচেয়ে সোরগোল বাধালে মুরগীরা। আঙিনায় ছুটোছুটি করে তারা রান্নাঘরের জানলায় উঠে চেঁচাতে লাগল:

'কোঁকর-কোঁ! কোঁকর-কোঁ-কোঁ... খিদে পেয়েছে আমাদের! রাঁধুনী মাত্রিওনা নিশ্চয় মরে গেছে, আমাদেরও না খাইয়ে মারতে চায়...'

'একটু ধৈর্য ধরুন মশাইরা,' এক পায়ে দাঁড়িয়ে বললে রাজহাঁস, 'আমায় দেখুন, আমিও তো খেতে চাই, কিন্তু আপনাদের মতো চেঁচাচ্ছি না। আমি যদি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতাম, যেমন ধরুন... প্যাঁক-প্যাঁক! কিংবা: প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক!'

এমন প্রচণ্ড ডাক ছাড়লে রাজহাঁস যে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙল রাঁধুনীর।

'ধৈর্য ধরার কথা বলতে ওর আর কী,' গজগজ করলে একটা পাতিহাঁস, 'কী বাজখাঁই গলা, যেন শিঙা। আর আমার যদি অমন লম্বা গলা আর শক্ত ঠোঁট থাকত, তাহলে আমিও সহ্য করা নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়তাম। নিজে ঝটপট সব খেয়ে নিতাম, আর অন্যদের বলতাম ধৈর্য ধরতে... রাজহাঁসের এই ধৈর্য আমাদের বেশ জানা আছে...'

পাতিহাঁসের কথায় সায় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মোরগ:

'সত্যি, ধৈর্য ধরার কথা বলার ভালো লোক জুটেছে রাজহাঁস... আর কাল আমার লেজ থেকে দুটি সুন্দর পালক খসিয়ে নিয়েছে কে? সোজাসুজি এসে লেজ চেপে ধরা — এযে অভদ্রতা। নয় মানলাম যে আমাদের খানিকটা ঝগড়া হয়েছিল, আমি চেয়েছিলাম রাজহাঁসের মাথায় ঠোকরাতে — অস্বীকার করছি না, তেমন একটা ইচ্ছে অবিশ্যি ছিল — কিন্তু সে দোষ আমার, লেজের তো নয়। ঠিক বলছি কিনা মশাইরা?'

ভুখা লোকেদের মতো ভুখা পাখিরাও অন্যায্য ব্যবহার করে ঠিক এই জন্যে যে তারা ভুখা।

২

নিজের সম্পর্কে টার্কির গর্ব ছিল, তাই খাবার দেখে সে সবার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত না, সবুর করত কখন মাত্রিওনা অন্যান্য লোভী পাখিদের তাড়িয়ে তাকে ডাকবে।

এবারেও তাই হল। দূরে বেড়ার কাছে চরে বেড়াতে লাগল টার্কি, ভাব করলে যেন আবর্জনার মধ্যে কী একটা খুঁজছে।

'খক্-খক্-খক্... উঃ, কী ক্ষিদে পেয়েছে!' স্বামীর পেছু পেছু পা চালিয়ে অনুযোগ করলে টার্কিগিন্নি, 'ওই তো মাত্রিওনা যব ছড়িয়ে দিলে... মনে হচ্ছে কালকের মণ্ডও খানিকটা... আহ্, মণ্ড আমি কী ভালোই না বাসি! সারা জীবন আমি মণ্ড খেয়েই কাটাতে রাজী। মাঝে মাঝে তা দেখি স্বপ্নেও...'

খিদে পেলে নালিশ করতে ভালোবাসত টার্কিগিন্নি, চাইত যেন টার্কি অবশ্য-অবশ্যই তার পক্ষ নেয়। পাখিদের মধ্যে তাকে দেখাত বুড়ির মতো: সবসময় কুঁজো, অনবরত কাশে, হাঁটে এমন একটা টলমলে ঢঙে, যেন পা-দুটো তার লাগানো হয়েছে মাত্র গতকাল।

'হ্যাঁ, মণ্ড খেতে ভালোই,' তার কথায় সায় দিল টার্কি, 'তবে বুদ্ধিমান পাখি কখনো খাবারের জন্যে আকুলিবিকুলি করে না। ঠিক বলছি কিনা? মালিক যদি আমায় না খাওয়ায়, তবে না খেয়েই মরব... ঠিক? কিন্তু এমন টার্কি সে আর পাবে কোথায়?'

'এমন আর কোথাও নেই...'

'ঠিক কথা... আর মণ্ড আসলে কোনো কথাই নয়। হ্যাঁ... ব্যাপারটা মণ্ড নিয়ে নয়, মাত্রিওনাকে নিয়ে। ঠিক বলছি কিনা? মাত্রিওনা থাকলে মণ্ডও থাকবে। দুনিয়ার সবকিছু নির্ভর করছে কেবল মাত্রিওনার ওপর — যব, মণ্ড, ক্ষুদ, রুটির চটা, সবই।'

এসব বুদ্ধিমন্ত কথা সত্ত্বেও খিদের জ্বালা টের পাচ্ছিল টার্কি। তারপর সমস্ত পাখির খাওয়া হয়ে যাবার পরেও যখন মাত্রিওনা তাকে ডাকার জন্যে বেরিয়ে এল না, তখন ভারি তার দুঃখু হল। তার কথা কি ভুলে গেছে? এযে ভারি বিছছিরি ব্যাপার...

কিন্তু এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে নিজের খিদের কথাও ভুলে গেল টার্কি। ব্যাপারটা শুরু হয় অল্পবয়সী একটা মুরগীর চিৎকারে। গোলাঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল সে, হঠাৎ ডেকে ওঠে:

'কোঁকর-কোঁ!'

অন্য সমস্ত মুরগীও ধুয়া ধরে প্রাণপণে চেঁচাতে থাকে: 'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ...' আর সবচেয়ে বেশি গলা ফাটায় মোরগটা:

‘খবরদার! কে ওখানে?’

ডাকাডাকিতে পাখিরা ছুটে গিয়ে দেখে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গোলাঘরটার কাছেই গর্তের মধ্যে কী একটা পড়ে আছে ধূসর মতো, গোলগাল দেখতে, সর্বাঙ্গে খোঁচা খোঁচা কাঁটা।

কে যেন বললে, ‘এটা একটা সাধারণ পাথর।’

মুরগীটা বললে, ‘ও কিন্তু নড়ছিল। আমিও ভেবেছিলাম পাথর। কাছে যেতেই এমন নড়ে উঠল... মাইরি! আমার মনে হল ওর যেন চোখ আছে, অথচ পাথরের তো চোখ থাকে না।’

‘ভয়ে বোকা মুরগীর কত কীই তো মনে হতে পারে,’ মন্তব্য করলে টার্কি, ‘হয়ত এটা... এটা...’

‘হ্যাঁ, এটা ব্যাঙের ছাতা!’ চেঁচাল রাজহাঁস, ‘হুবহু ঠিক অমনি ব্যাঙের ছাতা আমি দেখেছি, শুধু তার গায়ে কাঁটা ছিল না।’

রাজহাঁসের কথায় সবাই সজোরে হেসে উঠল।

‘এটা বরং একটা টুপি,’ অনুমান করার চেষ্টা করল কে যেন, তার ভাগ্যেও টিটকারি জুটল।

‘টুপির কি চোখ থাকে মশাইরা?’

‘বেফায়দা আলাপ করে লাভ কী, দরকার কাজ,’ সবার হয়ে সিদ্ধান্ত নিলে মোরগ, ‘এই ওহে, কাঁটা-খোঁচা, কোন জন্তু তুই বলে ফ্যাল বাপু, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না।’

উত্তর না পেয়ে অপমান বোধ হল মোরগের। তেড়ে গেল সে অজানা অপমানকারীর দিকে। বার দুই ঠোকর মেরে সরে গেল থতোমতো মুখে।

‘এটা... এটা হল ভাঁটুই গাছের একটা মস্তো মোচা ছাড়া আর কিছুই নয়,’ বোঝালে সে, ‘খেতে ভালো নয়... চেখে দেখবে নাকি কেউ?’

যার মাথায় যা এল বলে গেল সবাই। আন্দাজ অনুমানের আর শেষ নেই। চুপ করে ছিল কেবল টার্কি। বকবক করতে হয় অন্যেরা করুক, সে শুনে যাবে তাদের বোকা-বোকা কথা। অনেকক্ষণ জটলা করলে, চেঁচালে, তর্ক করলে পাখিরা, শেষ পর্যন্ত কে একজন বলে উঠল:

'কেন মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন মশাইরা, টার্কি রয়েছে যে, সব সে জানে...'

'জানি বইকি,' পেখম মেলে নাক ফুলিয়ে সাড়া দিল সে।

'যদি জানিস বল-না আমাদের।'

'বলার ইচ্ছে যদি না থাকে? স্রেফ ইচ্ছে নেই।'

সবাই মিনতি করতে লাগল টার্কিকে।

'তুই যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি। বল-না ভাই... বলতে তোর আর কী?'

অনেকক্ষণ ন্যাকামি করলে টার্কি, তারপর বললে:

'আচ্ছা বেশ, বলব... হ্যাঁ, বলব। তবে তার আগে তোরা আমায় বল, আমায় তোরা কী মনে করিস?'

'কে না জানে যে তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি!' সমস্বরে জবাব দিলে সবাই, 'কথায় বলে, টার্কির মতো বুদ্ধিমান।'

'তার মানে, তোরা আমায় মান্যি করিস?'

'করি, সবাই মান্যি করি!'

আরো কিছুটা ডাঁট নিলে টার্কি, তারপর পুরোপুরি পেখম মেলে, গলা ফুলিয়ে অদ্ভুত জন্তুটাকে তিন বার পাক দিয়ে বললে:

'এটা... হুঁ... জানতে চাস এটা কী?'

'জানতে চাই! শুধু দন্ধে মারিস না, চটপট বলে ফ্যাল।'

'এটা — কী একটা-যেন কোথায়-যেন যাচ্ছে...'

সবাই হেসে উঠতে যাবে, এমন সময় শোনা গেল একটা মিহি গলা আর হাসি:

'দ্যাখো, কেমন সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি! হি-হি...'

কাঁটাগুলোর তল থেকে দেখা গেল কালো একটা মুখ, কালো কালো চোখ। বাতাস শুঁকে সে বললে:

'নমস্কার মশাইরা... সজারুকে চিনতে পারলে না কেন? সেই যে — কাঁটাল-নাড়ু সজারু? ওহ্, কী হাস্যকর তোমাদের এই টার্কি, কী... মানে ভদ্রতা করে কী যে বলা যায়? মানে কী হাঁদারাম টার্কি...'

৩

টার্কিকে সজারু যে অপমানটা করলে, তাতে এমনকি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সবার। টার্কি অবিশ্যি বোকার মতো কথা বলেছে, সেটা সত্যি, তাই বলে তাকে অপমান করার অধিকার পাবে সজারু, এটা চলে না। আর শেষ কথা, এটা যে স্রেফ অভদ্রতা: পরের বাড়ি এসে গৃহকর্তাকেই অপমান করা। যাই বলো, টার্কি হাজার হোক রাশভারী, দর্শনধারী পাখি, কোন না কোন এক হতভাগা সজারু তার পাশে দাঁড়াতেই পারে না।

সবাই একসঙ্গে চলে এল টার্কির পক্ষে, শুরু হল মহা হট্টগোল।

'ঠিক কথা, আমাদেরও বোকা ভাবে সজারু!' ডানা ঝটপট করে চেঁচাল মোরগ।

'আমাদের সবাইকেই অপমান করেছে সে!'

'যদি কেউ বোকা হয়, তাহলে ওই সজারুটাই বোকা,' গলা বাড়িয়ে ঘোষণা করলে রাজহাঁস, 'ওকে দেখেই আমি তা টের পেয়েছিলাম হে!'

'কিন্তু ব্যাঙের ছাতা কি বোকা হতে পারে?' জবাব দিলে সজারু।

'ওর সঙ্গে খামোকা কথা চালিয়ে লাভ কী মশাইরা?' চেঁচিয়ে উঠল মোরগ, 'যাই বলি, কিছুই ওর মাথায় ঢুকবে না। আমার মনে হচ্ছে, মিছেমিছি সময় নষ্ট করছি আমরা। যেমন, আপনি রাজহাঁস যদি আপনার শক্ত ঠোঁটে ওর কাঁটা কামড়ে ধরেন, আর আমি আর টার্কি যদি ধরি অন্য দিকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে কে বুদ্ধিমান। বুদ্ধি তো আর কাঁটা-চাপা থাকে না...'

'তা আমি রাজী...' ঘোষণা করলে রাজহাঁস, 'আরো ভালো হবে যদি আমি ওর কাঁটা কামড়ে ধরি পেছন দিক থেকে আর আপনি মোরগ ওকে ঠোকরাবেন সোজাসুজি ওর চন্দ্রবদনে... ঠিক আছে মশাইরা? এখুনি দেখা যাবে কার বুদ্ধি বেশি।'

সারাটা সময় চুপ করে ছিল টার্কি। প্রথমটা সে স্তম্ভিত হয়ে যায় সজারুর আস্পর্ধায়, কী জবাব দেবে ভেবে পায় নি। তারপর রাগ হয়ে গেল টার্কির, এমন রাগ যে নিজেরই খানিকটা ভয়-ভয় করে উঠল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ওই চোয়াড়টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়, সবাই তা দেখুক, আরো একবার বুঝুক কীরকম গুরুগম্ভীর কড়া পাখি সে। সজারুর দিকে কয়েক পা এগিয়েও সে গিয়েছিল, রাগে একেবারে আগুন, তারপর যেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি শুরু

হয়েছিল সজারুর ওপর চোটপাট, গালাগালি। টার্কি থেমে গিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে কতদূর গড়ায়।

মোরগ যখন নানান দিক থেকে সজারুর কাঁটা ঃ .র টানার প্রস্তাব দেয়, তখন তার উৎসাহ থামিয়ে দেয় টার্কি:

'একটু থামুন মশাইরা... হয়ত শান্তিতেই ব্যাপারটার ফয়সালা করা যাবে হে... আমার মনে হচ্ছে এখানে খানিকটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সব ব্যাপারটা আমার হাতে তুলে দিন মশাইরা...'

'বেশ, আমরা সবুর করছি,' অনিচ্ছায় রাজী হল মোরগ, তার ঝোঁক ছিল, চটপট সজারুর সঙ্গে মারপিট লাগায়, 'তবে ফল কিছুই হবে না এ থেকে...'

'সেটা আমার ব্যাপার,' শান্তভাবে জবাব দিল টার্কি। 'এবার আমি কীভাবে কথা বলছি, শুনুন আপনারা...'

ভিড় করে এল সবাই। টার্কি সজারুকে পাক দিয়ে কেশে বললে:

'শুনুন সজারু মশাই... গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন। ঘরোয়া অশান্তি আমার পছন্দ নয়।'

'বাঃ, কী বুদ্ধিমান ও, কী বুদ্ধিমান!' মুখবোজা আনন্দে ভাবলে টার্কিগিন্নি।

'সবার আগে এইটে মনে রাখুন যে আপনি রয়েছেন একটা সভ্যভব্য সমাজে,' বলে গেল টার্কি, 'সেটার কিছু গুরুত্ব আছে... হুঁ-হুঁ... আমাদের আঙিনায় আসতে পেলে অনেকে কৃতার্থ বোধ করে তবে সে সৌভাগ্য লোকের হয় কম।'

'ঠিক কথা! ঠিক কথা!' বলে উঠল সবাই।

'তবে এটা শুধু বললাম এমনি এমনি, ওটা শুধু জানা থাক আমাদের দুজনের মধ্যে, ওটা প্রধান ব্যাপার নয়...'

থামল টার্কি, গুরুত্ব ফোটাবার জন্যে চুপ করে রইল খানিকখন, তারপর বলে গেল:

'হ্যাঁ, প্রধান কথাটা... সত্যিই কি আপনি ভেবেছিলেন যে সজারু সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আমাদের? আমার কোনো সন্দেহই নেই যে আপনাকে ব্যাঙের ছাতা বলে রাজহাঁস কেবল ঠাট্টা করছিল, মোরগও তাই, অন্যান্যেরাও... সত্যি না মশাইরা?'

'একেবারে হক কথা টার্কি!' সবাই সমস্বরে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে সজারু গুটিয়ে নিলে তার কালো মুখটা।

'ওহ্, কী বুদ্ধিমান!' ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আন্দাজ করার চেষ্টা করে খুশি হয়ে উঠল টার্কিগিন্নি।

'মানে, বুঝেছেন তো সজারু মশাই, আমরা সবাই ঠাট্টা-তামাশা ভালোবাসি,' বলে গেল টার্কি, 'আমার নিজের কথা তো আমি ছেড়েই দিচ্ছি... হুঁ। কেনই বা ঠাট্টা করব না। আর আমার যা ধারণা সজারু মশাই, আপনার স্বভাবটাও আমুদে...'

'আহ্, ধরেছেন ঠিক,' আবার মুখটি বার করে মেনে নিলে সজারু, 'এমন আমুদে আমার স্বভাব যে রাতের পর রাত ঘুম হয় না... সেটা সহ্য হয় না অনেকের, কিন্তু ঘুমতে আমার বেজার লাগে।'

'দেখলেন তো... আপনার স্বভাবটা বোধ হয় আমাদের মোরগের মতো, রাতে সে এমন ডাক ছাড়ে যেন পাগলা।'

সবারই এমন ফুর্তি লাগল যেন ভরপুর জীবনের পক্ষে অভাব ছিল কেবল এই সজারুটিরই। সজারু তাকে হাঁদা বলে সরাসরি টিটকারি দেওয়ায় যে বেকায়দায় পড়েছিল, তা থেকে এমন কায়দা করে বেরিয়ে আসতে পেয়েছে বলে গর্বই হল টার্কির। হেসে উঠে চোখ টিপে সে বললে:

'কথায় কথায় বলি সজারু মশাই, আপনি যখন আমায়, মানে... ইয়ে — এই অল্পবুদ্ধি পাখি বলেছিলেন, স্বীকার করুন যে তা বলেছিলেন ঠাট্টা করেই, তাই না?'

'বটেই তো, ঠাট্টা!' আশ্বাস দিলে সজারু, 'আমার স্বভাবটাই ভারি আমুদে!'

'নিশ্চয়, এতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। শুনলেন তো মশাইরা?' সবাইকে জিজ্ঞেস করল টার্কি।

'শুনলাম বৈকি... ওতে আর সন্দেহের কী আছে!'

টার্কি সজারুর একেবারে কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে:

'বেশ; তাই হোক, ভয়ানক একটা গোপন কথা আপনাকে বলি। তবে একটা শর্ত: কাউকে বলবেন না যেন। অবিশ্যি নিজ মুখে নিজের সম্পর্কে বলতে একটু লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু কী করা যাবে যদি সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি হয়ে থাকে আমি! মাঝে মাঝে তার জন্যে লজ্জাই হয়, তবে ধর্মের ঢাক যে আপনি বাজে... কিন্তু এ নিয়ে কাউকে একটি কথাও বলবেন না যেন!'

দুধ,
যবের মণ্ড
আর
ছেয়ে বেড়াল
মুরকা

‘আমি বেড়াল, বেড়াল, বেড়াল...’

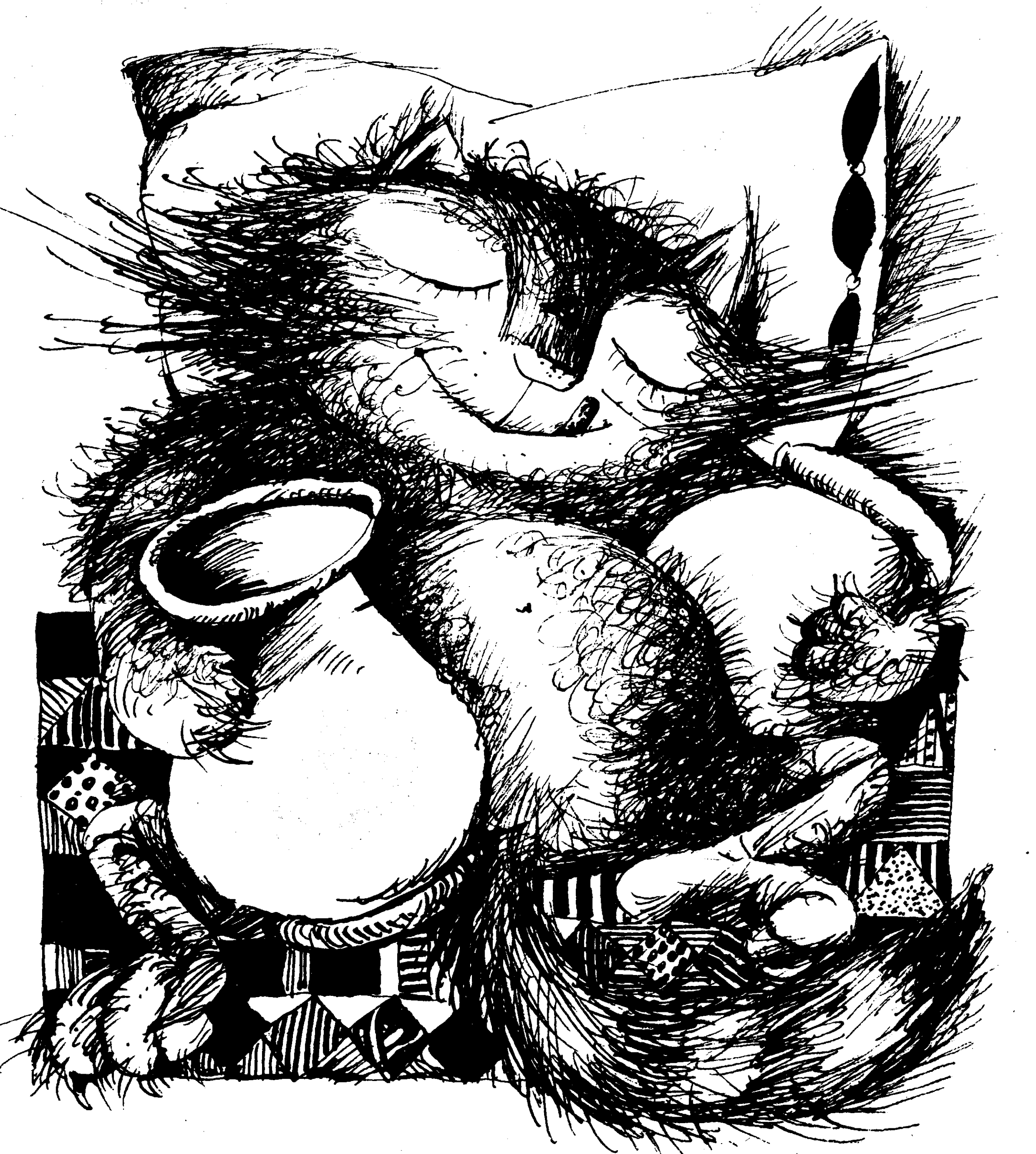

১

যাই বলো, আশ্চর্য ব্যাপার! আর সবচেয়ে আশ্চর্য যে ঘটনাটা ঘটত প্রত্যেক দিন। সত্যি, রান্নাঘরে যেই উনুনে চাপানো হয় এক হাঁড়ি দুধ আর একটা মেটে পাত্রে যবের মণ্ড, অমনি শুরু হয়ে যায়। প্রথমটা বিশেষ কিছু না, তারপর আরম্ভ হয় আলাপ:

'আমি দুধ...'

'আর আমি যবের মণ্ড!'

প্রথমটা আলাপ চলে চুপচাপ, ফিসফিসিয়ে, তারপর ক্রমাগত চড়তে থাকে মণ্ড আর দুধের মেজাজ।

'আমি দুধ!'

'আর আমি যবের মণ্ড!'

মণ্ডের পাত্র ঢাকা দেওয়া থাকত একটা মেটে ঢাকনায়, আর বুড়ির মতো তা গজগজ করত পাত্রটায়। আর যখন মেজাজ চড়তে থাকত, তখন ভুড়ভুড়ি ছাড়ত ওপরে, ফেটে যেত আর বলত:

'যতই হোক আমি যবের মণ্ড... ফট্!'

দুধের কাছে এই বড়াইটা ঠেকত ভয়ংকর অপমানকর। দ্যাখোই-না, কী এক যবের মণ্ড — বড়ো আমার আহামরি! রাগ বাড়ত দুধের, ফেনিয়ে উঠে বেরিয়ে আসতে

চাইত পাত্র থেকে। রাঁধুনী একটু অন্যমনস্ক হলেই দুধ উথলে পড়ত তপ্ত উনুনে।

'আহ্, দুধ আমায় জ্বালালে,' প্রত্যেক বার গজগজ করত রাঁধুনী, 'একটু চোখ সরিয়েছি কি, অমনি উথলে পড়বে।'

'কী করি যদি আমার স্বভাবটাই হয় এমনি রগচটা?' কৈফিয়ৎ দিত দুধ, 'আমার নিজেরই খুশি লাগে না যখন রাগি। তার ওপর আবার অনবরত বড়াই করে বলে চলেছে মণ্ড: 'আমি মণ্ড, আমি মণ্ড, আমি মণ্ড...' নিজের পাত্রটিতে বসে গজগজ করে। আমিও রেগে যাই।'

ব্যাপারটা মাঝে মাঝে এতদূর গড়াত যে মণ্ডও তার ঢাকনা ঠেলে উথলে পড়ত উনুনে আর কেবলি বলত:

'আমি মণ্ড! মণ্ড! মণ্ড...'

অবিশ্যি এটা তেমন ঘনঘন ঘটত না সত্যি, তাহলেও ঘটত, আর হতাশ হয়ে প্রতিবার বলত রাঁধুনী:

'জ্বালালে আমায় মণ্ড! কেন যে পাত্রে বসে থাকে না, আশ্চর্য!'

২

মোটের ওপর রাঁধুনী প্রায়ই ভারি অস্থির হয়ে উঠত। আর অস্থির হবার নানান কারণও ছিল অনেক... যেমন এক বেড়াল মুরকাকেই নিয়েই কত ঝামেলা! মনে রেখো, বেড়ালটা ছিল কিন্তু ভারি সুন্দর, রাঁধুনীও খুব ভালো বাসত তাকে। রোজ সকাল হতেই মুরকা রাঁধুনীর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত আর মিউ-মিউ ডাক ছাড়ত এমন করুণ সুরে যে মনে হত পাষাণহৃদয়ও ফেটে যাবে।

'ইস্, কী একখান খাই-খাই পেট!' বেড়ালকে তাড়া দিয়ে অবাক হত রাঁধুনী, 'কাল শুধু মেটে খেলি কত?'

এবার অবাক হবার পালা মুরকার, 'সে তো কাল! আর আজ যে ফের খিদে পেয়েছে... ম্যাও!'

'ইঁদুর ধরে খেলেই পারিস, আলসেটা।'

'বলা তো সহজ, নিজেই ধরে দ্যাখো-না অন্তত একটা ইঁদুর', কৈফিয়ৎ দিত মুরকা, 'তাছাড়া, আমি তো মনে হয় চেষ্টা করি যথেষ্টই... যেমন গত সপ্তাহে কে ধরল ইঁদুর-ছানাটা? আর এই যে সারা নাকে আঁচড়, তা দিল কে? কেমন একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরতে গিয়েছিলাম, আর সে কিনা কামড়ে ধরল আমার নাক... ইঁদুর ধরো, বলা তো খুব সহজ!'

মেটে খেয়ে চুল্লির কাছে যেখানে খানিকটা গরম সেখানে কোথাও জায়গা করে নিয়ে দিব্যি ঘুমায় মুরকা।

'দেখেছ, কী পেট পুরে খেয়েছে,' অবাক হত রাঁধুনী, 'চোখও বুজে এসেছে, আলসে কোথাকার! অথচ কেবলি মাংস চাই ওর!'

'আমি তো আর সন্ন্যাসী নই যে মাংস খাব না,' মাত্র একটা চোখ খুলে জবাব দিত মুরকা, 'তাছাড়া মাছ খেতেও আমি ভালোবাসি... বলতে কি ওটা খুবই উপাদেয়। আজো পর্যন্ত আমি বলতে পারব না কোনটা বেশি ভালো, মেটে নাকি মাছ। ফেলতে নেই, তাই দুটোই খাই। মানুষ হলে আমি নির্ঘাৎ হতাম জেলে কিংবা মেটে বইবার কুলি, বাড়ি বাড়ি যে মেটে এনে দেয়। দুনিয়ার সমস্ত বেড়ালকে খাওয়াতাম ঠেসেমুড়ে, নিজেও থাকতাম ভরপেট।'

পেটটি ভরা থাকলে মুরকা নিজের আনন্দের জন্যে অন্যের নানা ব্যাপারে নাক গলাত। নইলে স্টার্লিঙের খাঁচাটি ঝুলত যে জানলার ওপর, সেখানে ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকত সে কেন? বোকা পাখিটা কেমন লাফালাফি করছে, সেটা দেখতে ভারি ভালো লাগত তার।

'আমি তোকে চিনি, ধেড়ে বদমাইস!' ওপর থেকে চেঁচাত স্টার্লিং, 'আমায় দেখবার কিছু নেই...'

'আর তোর সঙ্গে যদি আলাপ করার ইচ্ছে হয় আমার?'

'জানি, জানি তোর আলাপ... সত্যিকারের জ্যান্ত একটা চড়ুই সেদিন খেলে কে? উঃ, অসহ্য!'

'মোটেই অসহ্য নয়, বরং উল্টো। সবাই আমায় ভালোবাসে... আয় আমার কাছে, আমি গল্প শোনাব।'

'ওরে বদমাইস... ভারি আমার গল্প-বলিয়ে! দেখেছি তুই রান্নাঘরে ভাজা মুরগীর ছানাটা চুরি করার সময় কী গল্প বলেছিলি তাকে। ভ্যালা আমার লোক!'

'কী জানিস, আমি যে তোকে আনন্দ দেবার জন্যেই বলছি। আর মুরগী ভাজাটার কথা যদি বলিস, তবে সেটা আমি সত্যিই খেয়েছি; ওটা তো আর কোনো কম্মেই লাগত না।'

৩

তবে এই ফাঁকে বলি, রোজ সকালে মুরকা তপ্ত উনুনের কাছে বসে দুধ আর মণ্ডের ঝগড়া শুনত। ব্যাপার কী কিছুই বুঝতে পারত না সে, কেবল চোখ মিটমিট করত।

'আমি দুধ।'

'আমি মণ্ড! মণ্ড, মণ্ড!'

'না, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না! একেবারে বুঝি না,' বলত মুরকা, 'রাগারাগি করার কী আছে? যেমন, আমি যদি কেবলি বলি যে আমি বেড়াল, বেড়াল, বেড়াল... তাতে রাগ হবে কার? উঁহু, কিছুই বুঝছি না... তবে কবুল করছি যে দুধ আমি ভালোবাসি, বিশেষ করে যখন তার মেজাজ ঠাণ্ডা।'

একবার দুধ আর মণ্ডের মধ্যে খুবই তুলকালাম ঝগড়া বাধল; এমন ঝগড়া যে আধাআধিই উথলে পড়ল উনুনে, ধোঁয়া উঠল প্রচণ্ড। ছুটে এল রাঁধুনী, হতাশায় হাত ওলটালে।

উনুন থেকে দুধ আর মণ্ড নামিয়ে গজগজ করলে, 'কী করি এখন? একটু পেছন ফেরারও জো নেই...'

দুধ আর মন্ড নামিয়ে রেখে রাঁধুনী গেল বাজার করতে। অমনি সুযোগটা ছাড়ল না মুরকা। দুধের কাছে গিয়ে ফুঁ দিয়ে সে বললে:

'দোহাই তোর, রাগ করে থাকিস না দুধ...'

বেশ শান্ত হয়ে উঠতে লাগল দুধ। মুরকা তাকে একপাক ঘুরে আরো একবার ফুঁ দিলে, মোচটি ঠিক করে খুবই সোহাগ করে বললে:

'শুনুন মশাইরা... ঝগড়া করা মোটেই ভালো নয়। আমায় সালিশ মানুন, এক্ষুনি সব মিটিয়ে দেব...'

ফাটলে বসে ছিল কালো তেলাপোকা, হেসে তার পেট ফাটার জোগাড়: 'আচ্ছা তোমার সালিশ... হা-হা! ধেড়ে বদমাইস কত মতলবই না আঁটে!' কিন্তু তাদের ঝগড়ার একটা কিনারা হবে ভেবে খুশি হয়ে উঠল দুধ আর মণ্ড। নিজেরাই তারা বলতে পারল না ব্যাপারটা কী, কেন ঝগড়া বাধে ওদের।

'ঠিক আছে, আমি সব বিচার করে দেখব,' বললে মুরকা বেড়াল। 'অন্যায় আমি করব না... তাহলে শুরু করা যাক দুধকে দিয়ে।'

বার কয়েক সে দুধের পাত্রটার চারপাশে ঘুরল, থাবা দিয়ে পরখ করলে, ফুঁ দিল ওপর থেকে, তারপর চাটতে লাগল।

'ওই মাগো! কে আছ বাঁচাও!' চেঁচিয়ে উঠল তেলাপোকা, 'সব দুধ ও মেরে দিচ্ছে, ওদিকে লোকে ভাববে ওটা আমার কাণ্ড।'

বাজার থেকে ফিরে রাঁধুনী দেখে পাত্রে এতটুকুও দুধ নেই। মুরকা বেড়াল চুল্লির কাছে ঘুম মারছে আরামে, যেন কিছুই হয় নি।

'আরে হতচ্ছাড়া!' তার কান মলে গালাগালি দিলে রাঁধুনী, 'কে দুধ খেয়েছে, বল শিগগির।'

কানে যতই ব্যথা লাগুক মুরকা বেড়াল ভাব করলে যেন বুঝছে না কিছুই, কথা বলতেও পারে না যেন। যখন ওকে দরজার বাইরে ছুড়ে ফেলা হল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, এলোমেলো লোমগুলো চেটে, লেজটি ঠিক করে নিয়ে বললে:

'আমি যদি হতাম রাঁধুনী, তাহলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সমস্ত বেড়াল যাতে কেবল দুধ খায়, তার ব্যবস্থা করতাম। তবে রাঁধুনীর ওপর রাগ নেই আমার, কেননা এ ব্যাপারটা সে বোঝে না...'

আয় ঘুম

'ঘুমো আলিওনুশকা!
শরীরটা ঝরঝরে করে নে...'

১

আলিওনুশকার একটি চোখ ঘুমিয়ে পড়ছে, ঘুমিয়ে পড়ছে অন্য কানটি...

'বাবা, তুমি আছ এখানে?'

'আছি বেটী...'

'জানো বাবা... আমি হতে চাই রাজরানী...'

ঘুমিয়ে পড়ে আলিওনুশকা, হাসে ঘুমের মধ্যে।

আহ্, ফুল কত! তারাও হাসে। আলিওনুশকার খাট ঘিরে ফিসফিস করে, হাসে খিলখিলিয়ে। লাল ফুল, নীল ফুল, হলুদ ফুল, আসমানী, আলতা-রঙা, গোলাপী, শাদা — যেন রামধনু ভেঙে পড়েছে মাটিতে, ছিটিয়ে গেছে নানান রঙের ছটা আর শিশুর চোখের ঝিলিক।

'আলিওনুশকা হতে চায় রাজরানী!' সরু সরু সবুজ ডাঁটির ওপর দুলে দুলে ফুর্তি করে ঝুনঝুন করে উঠল মেঠো ঘণ্টি ফুল।

'ইস্, কী হাসির কথা!' ফিসফিস করে বললে শান্তশিষ্ট ফরগেট-মি-নট।

'গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটার বিচার করা দরকার মশাইরা,' ফুঁসে উঠল হলুদ ড্যানডেলিয়ন 'আমি অন্তত এটা আশা করি নি...'

'রাজরানী হওয়া মানেটা কী?' জিজ্ঞেস করলে মাঠের নীল ঝুমকো ফুল, 'আমার বাস মাঠে, তোমাদের শহুরে হালচাল ঠিক বুঝি না।'

'খুব সোজা কথা...' নাক গলালে গোলাপী কারনেশন, 'এত সোজা যে বুঝিয়ে বলারও দরকার নেই। রাজরানী হল গিয়ে... রাজরানী হল... কিছুই এখনো বুঝলে

না? কী আশ্চর্য লোক তোমরা... রাজরানী হল আমার মতো গোলাপী ফুল। অর্থাৎ আলিওনুশকা হতে চায় কারনেশন। বুঝলে এবার?'

সবাই ফুর্তিতে হেসে উঠল। চুপ করে রইল কেবল গোলাপেরা। অপমান লাগছিল তাদের। কে না জানে যে ফুলের রাজ্যে রানী কেবল গোলাপ — নরম, সুগন্ধি, অপূর্ব। হঠাৎ কে এক কারনেশন এসে নিজেকে বলছে কিনা রানী... এযে অনাসৃষ্টি ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত একটা গোলাপ রাগে গোলাপী হয়ে উঠে বললে:

'মাপ করবেন, আলিওনুশকা চায় গোলাপ হতে... হ্যাঁ! সবাই গোলাপকে ভালোবাসে বলেই সে রানী।'

'আহা, কী সাধ!' রেগে উঠল ড্যানডেলিয়ন, 'তাহলে আমি কে শুনি?'

'রাগ করবেন না ড্যানডেলিয়ন,' বোঝালে তাকে মেঠো ঘণ্টি ফুলেরা, 'ওতে স্বভাব বিগড়ে যায়, তাছাড়া ওটা ভালোও নয়। এই তো আমরা — চুপ করে আছি, আলিওনুশকা যে হতে চায় ঘণ্টি ফুল, গলা বাড়িয়ে সেটা বলতে যাচ্ছি না, সে তো সবার কাছেই পরিষ্কার।'

২

ফুল ছিল অনেক, ভারি মজার তাদের তর্ক, হাসি পায়। মেঠো ফুলগুলো ছিল মুখচোরা — যেমন, মেঠো লিলি, ভায়োলেট, ফরগেট-মি-নট, ঘণ্টি ফুল, ঝুমকো, মেঠো কারনেশন। আর তাপঘরে যাদের জন্ম, তারা বেশ গুমোর দেখালে — গোলাপ, টিউলিপ, লিলি, নার্সিসাস, গিলি-ফ্লাওয়ার — ঠিক যেন পরবের দিনে বড়োলোকদের সাজগোজ-করা ছেলেমেয়ে। আলিওনুশকা সবচেয়ে ভালোবাসত নিরহঙ্কার মেঠো ফুল, তা দিয়ে বানাত তোড়া, মুকুট। কীযে সুন্দর!

'আলিওনুশকা আমাদের ভারি ভালোবাসে,' ফিসফিস করলে ভায়োলেটরা, 'আমরা যে বসন্তের প্রথম ফুল। বরফ গলতেই আমরাও অমনি হাজির।'

'আমরাও,' বললে মেঠো লিলি, 'আমরাও বসন্তের ফুল... আমাদের কোনো খুঁতখুঁতি নেই, বেড়ে উঠি স্রেফ বনেই।'

'কিন্তু সোজাসুজি মাঠে বেড়ে উঠতে যদি আমাদের শীত করে, তাহলে আমাদের দোষটা কী?' অনুযোগ করলে গন্ধে ভুরভুর কোঁকড়া-পাপড়ি গিলি-ফ্লাওয়ার আর

হায়াসিন্থ, 'এখানে আমরা শুধু বেড়াতে এসেছি, জন্মভূমি আমাদের অনেক দূরে। সে জায়গা এত গরম যে শীত প্রায় পড়েই না। আহ্, কী আরাম সেখানে, কেবলি মন কেমন করে দেশের জন্যে... তোমাদের এখানে, উত্তরে ভারি ঠাণ্ডা। আলিওনুশকা আমাদেরও, বলতে কি, খুবই ভালোবাসে...'

'আমাদের এখানেও বেশ আরাম,' তর্ক করলে মেঠো ফুলেরা, 'মাঝে মাঝে অবিশ্যি খুবই ঠাণ্ডা পড়ে, কিন্তু সে তো চমৎকার... তাছাড়া কেঁচো, কীট-পতঙ্গ, যারা আমাদের শত্রু, তারা মারা পড়ে ঠাণ্ডায়। ঠাণ্ডা না হলে আমাদের খুবই বিপদ হত।'

'আমরাও ঠাণ্ডা ভালোবাসি,' নিজে থেকেই বললে গোলাপেরা।

একই কথা বললে আজালি আর ক্যামেলিয়া। ফুল তোলা হলে সবাই তারা ভালোবাসে ঠাণ্ডা।

'শুনুন মশাইরা, নিজের নিজের দেশের কথা বলা যাক,' প্রস্তাব দিলে শাদা নার্সিসাস, 'চমৎকার হবে তাহলে... আমাদের কথা শুনবে আলিওনুশকা। সে যে আমাদের ভালোবাসে...'

অমনি সবাই একসঙ্গে কথা কয়ে উঠল। শিরাজের স্নিগ্ধ উপত্যকার কথা মনে হতে গোলাপদের চোখ ভরে উঠল জলে। হায়াসিন্থের মনে পড়ল প্যালেস্টাইনের কথা, আজালিদের আমেরিকা, লিলিদের মিশর... দুনিয়ার নানাখান থেকে ফুলেরা জুটেছে এখানে, প্রত্যেকেরই বলবার কথা অনেক। বেশির ভাগ ফুল এসেছে দক্ষিণ থেকে, যেখানে অঢেল রোদ, শীত নেই। কী মজা সেখানে! বারোমেসে গ্রীষ্ম! কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ জন্মায় সেখানে। কী অপরূপ সব পাখি, উড়ন্ত ফুলের মতো রূপসী প্রজাপতি আর প্রজাপতির মতো ফুল সেখানে কত!

'উত্তরে আমরা বাইরের লোক, ঠাণ্ডা লাগে আমাদের,' ফিসফিস করলে এইসব দক্ষিণী গাছেরা।

তাদের জন্যে এমনকি কষ্টই হল এখানকার মেঠো ফুলেদের। সত্যিই যখন বয় ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া, ঠাণ্ডা বৃষ্টি কি তুষারকণা পড়ে, তখন বেশ সহ্যশক্তি দরকার। নয় মানলাম যে বাসন্তী তুষার তাড়াতাড়ি গলে যায়, তাহলেও তুষার তো।

এইসব কাহিনী শুনে ঝুমকো ফুল বললে, 'আপনাদের আছে একটা মস্তো দোষ। আপত্তি করব না যে আপনারা আমাদের, সাধারণ মেঠো ফুলেদের চেয়ে মাঝে মাঝে

অনেক সুন্দর... আমি সেটা অনায়াসে মেনে নেব... মোট কথা, আপনারা আমাদের বরণীয় অতিথি। কিন্তু আপনাদের একটা বড়ো দোষ এই যে আপনারা জন্মান কেবল বড়োলোকদের জন্যে, আর আমরা সবার জন্যে। আমরা অনেক বেশি দিলখোলা... যেমন আমি, আমায় আপনারা দেখবেন গাঁয়ের প্রতিটি ছেলেমেয়ের হাতে। গরিব ছেলেমেয়েদের কত আনন্দ তাতে। আমায় টাকা দিয়ে কিনতে হয় না, শুধু মাঠে গেলেই হল। বেড়ে উঠি আমি গম, রাই, যবের সঙ্গে...'

৩

ফুলগুলো কী বললে সব কানে গেল আলিওনুশকার, অবাক হল সে। যেসব আশ্চর্য দেশের কথা ওরা বলাবলি করলে তা নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে হল তার।

'আমি যদি হতাম ভরত পাখি তাহলে এক্ষুনি উড়ে যেতাম,' শেষ পর্যন্ত বললে সে, 'কেন যে আমার পাখা নেই? আহ্, পাখি হতে পারলে কী ভালোই না হত!'

কথাটা বলতে না বলতেই তার কাছে উড়ে এল রাঙা ফড়িং। গায়ে কালো কালো দাগ, কালো মাথা, কালো শুঁড়, কালো কালো সরু ঠ্যাং, ভারি সুন্দর।

'আলিওনুশকা, চলো যাই,' শুঁড় নেড়ে বললে ফড়িং।

'আমার যে পাখা নেই ফড়িং!'

'আমার ওপর চাপো...'

'কী করে চাপব, তুমি যে ভারি ছোটো?'

'আরে দ্যাখোই-না...'

দেখতে লাগল আলিওনুশকা আর কেবলি তাজ্জব হয়ে গেল সে। ওপরকার শক্ত ডানাটা ঠিক করে নিলে ফড়িং, অমনি বড়ো হয়ে উঠল সে দ্বিগুণ। তারপর নিচেকার মাকড়শার জালের মতো মিহি পাখনাটা মেলতেই হয়ে উঠল প্রকাণ্ড, এত প্রকাণ্ড যে আলিওনুশকা অনায়াসে তার পিঠে চাপতে পারল। রাঙা রাঙা দুই ডানার মাঝখানে দিব্যি আরামে বসল সে।

'অসুবিধে হচ্ছে না আলিওনুশকা?' জিজ্ঞেস করলে রাঙা ফড়িং।

'একেবারে না।'

'তাহলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো...'

প্রথম যখন সে উড়ল, ভয়ে এমনকি চোখ বন্ধ করলে আলিওনুশকা। তার মনে হল উড়ছে সে নয়, নিচেকার সবকিছু — শহর, বন, নদী, পাহাড়। তারপর মনে হল সে হয়ে গেছে ভারি ছোটো, মাথাটা যেন পিনের মাথার মতো। ভারি হালকা, যেন ড্যানডেলিয়ন ফুলের রোঁয়া। ওদিকে রাঙা ফড়িং উড়ছে এত জোরে যে পাখায় শনশন করছে বাতাস।

'দ্যাখো নিচে কী আছে...' বললে রাঙা ফড়িং।

নিচে তাকিয়ে দেখে গালে হাত দিলে আলিওনুশকা।

'ইস, কত গোলাপ — লাল, হলদে, শাদা, গোলাপী!'

মাটি যেন গোলাপের জীবন্ত গালিচায় ঢাকা।

'মাটিতে নামা যাক,' বললে সে রাঙা ফড়িংকে।

নামল তারা, আলিওনুশকা হয়ে উঠল ফের আগের মতো বড়ো, আর ফড়িং আগের মতোই ছোটো।

গোলাপ ক্ষেতে অনেক ছোটাছুটি করলে আলিওনুশকা, বাঁধলে মস্তো এক তোড়া। কী সুন্দর এই গোলাপ। সুরভিতে মাথা ঘুরে ওঠে। কী ভালোই-না হত যদি গোলাপের এই গোটা ক্ষেতটা নিয়ে যাওয়া যেত উত্তরে, যেখানে গোলাপ শুধু নেমন্তন্নে-আসা বড়োলোক!

'এবার আরো এগুনো যাক,' পাখা ঠিকঠাক করে বললে রাঙা ফড়িং।

আবার সে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড, আর আলিওনুশকা এইটুকুনি ছোট্ট।

৪

আবার উড়তে লাগল তারা।

চারদিক কী সুন্দর! একেবারে নীল আকাশ আর নিচে আরো নীল সাগর। উড়ে এল তারা খাড়াই পাহাড়ে তীরের ওপর দিয়ে।

'সত্যিই কি সাগর পেরিয়ে যাব?' জিজ্ঞেস করলে আলিওনুশকা।

'হ্যাঁ... শুধু শান্তিতে বসে শক্ত করে ধরে থাকো।'

প্রথমটা আলিওনুশকার ভয়ই লেগেছিল, পরে তেমন কিছু না। আকাশ আর জল ছাড়া আর কিছু নেই। শাদা ডানা মেলা বড়ো বড়ো পাখির মতো জাহাজ ভাসছে সাগরে... ছোটো ছোটো নৌকোগুলোকে দেখায় মাছির মতো। কী সুন্দর, কী আনন্দ!

সামনে দেখা গেল উপকূল, নিচু হলদে বালুময়, কোন একটা মস্তো নদীর মোহানা, একেবারে শাদা কী একটা শহর, যেন চিনি দিয়ে গড়া। দূরে দেখা গেল মরা মরুভূমি, দাঁড়িয়ে আছে শুধু পিরামিড। নদীর তীরে থামল রাঙা ফড়িং। এখানে জন্মেছে সবুজ পাপিরাস আর অপূর্ব স্নিগ্ধ লিলি।

'কী সুন্দর তোমাদের জায়গাটা,' লিলিদের বললে আলিওনুশকা, 'তোমাদের এখানে শীত পড়ে না?'

'শীত, সে আবার কী?' অবাক হল তারা।

'শীত, মানে যখন বরফ পড়ে...'

'বরফ কী জিনিস?'

লিলিরা এমনকি হেসেই উঠল। ভাবলে, উত্তরের এই খুকিটি নিশ্চয় রগড় করছে। অবিশ্যি প্রতি হেমন্তে সেখান থেকে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, তারাও শীতের কথা বলে, তবে পাখিরা নিজেরা কখনো শীত দেখে নি, বলত কেবল শোনা কথা। আলিওনুশকারও বিশ্বাস হল না যে শীত হয় না এখানে। তার মানে ওভারকোট, ফেল্ট বুট কিছুরই দরকার নেই?

উড়ে গেল আরো। কিন্তু নীল সাগর, পাহাড়-পর্বত, রোদপোড়া মরুভূমি, যেখানে জন্মায় হায়াসিন্থ — কিছুতেই আর অবাক লাগে না আলিওনুশকার।

'বড্ডো গরম লাগছে...' অনুযোগ করলে সে, 'কী জানো রাঙা ফড়িং, বারোমেসে গ্রীষ্মকাল সত্যি তেমন ভালো নয়।'

'যার যা অভ্যেস আলিওনুশকা।'

উড়ে গেল তারা উঁচু উঁচু পর্বতের দিকে, চুড়োয় তাদের চিরকেলে বরফ। এখানটা তেমন গরম নয়। পর্বতের পর দুর্গম বন। গাছের তলায় অন্ধকার, ঘন ডালপালার ভেতর দিয়ে রোদ এখানে আসতে পারে না। ডালে ডালে বাঁদরের লাফালাফি। আর পাখি কত — সবুজ, লাল, হলুদ, নীল... কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এখানকার ফুল, ফুটেছে তা স্রেফ গাছেরই কাণ্ডে। কিছু ফুল একেবারে আগুনরঙা, কিছু রঙচঙে; কোনো কোনো ফুল ছোটো ছোটো পাখি আর বড়ো বড়ো প্রজাপতির মতো দেখতে — সারা বন যেন নানান রঙের ঝলকে জ্বলছে।

'এগুলো অর্কিড,' বুঝিয়ে বললে ফড়িং।

এখানে হাঁটা দুষ্কর, গাছে গাছে জড়াজড়ি।

আরো এগিয়ে গেল তারা। দেখা দিল সবুজ দুই পারের মধ্যে বিশাল এক বহতা নদী। ফড়িং নামল মস্তো এক শাদা ফুলের ওপর, জলেই তার জন্ম। এত বড়ো ফুল আলিওনুশকা আগে কখনো দেখে নি।

রাঙা ফড়িং বললে, 'পবিত্র ফুল। এর নাম পদ্ম...'

৫

অনেক দেখে দেখে হয়রান হয়ে পড়ল আলিওনুশকা, মন কেমন করল বাড়ির জন্যে। যতই হোক, দেশের চেয়ে কোথায় আর ভালো।

বললে, 'তুষারকণাই আমার পছন্দ। শীত ছাড়া ভালো লাগে না...'

ফের উড়ল তারা, যত ওপরে ওঠে ততই ঠাণ্ডা। শিগগিরই দেখা গেল নিচে বরফঢাকা মাঠ। সবুজ কেবল পাইন বন। প্রথম ফার গাছ দেখে ভারি খুশি হয়ে উঠল আলিওনুশকা।

'ফার গাছ, ফার গাছ!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

নিচে থেকে সাড়া দিল ফার গাছ, 'আরে আলিওনুশকা যে, এসো, এসো।'

এটা ঠিক বড়োদিনের ফার গাছ। আলিওনুশকা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল তাকে। আহ্ কী সুন্দর গাছ! আলিওনুশকা মুখ নামিয়ে তাকে কিছু ভালো কথা বলতে যাবে, হঠাৎ উলটে পড়ল নিচে। উহ্, কী ভয়ঙ্কর! শূন্যে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে সে পড়ল একেবারে নরম বরফের ওপর। ভয়ে চোখ বুজল আলিওনুশকা, ভেবে পেল না সে বেঁচে আছে, নাকি মরে।

'এখানে তুই এলি কী করে বেটি?' জিজ্ঞেস করলে কে যেন।

চোখ মেলে আলিওনুশকা দেখলে একেবারে শাদাচুলো কুঁজো এক বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গেই আলিওনুশকাও চিনতে পারল তাকে। এ সেই বুড়ো যে ভালো ছেলেদের জন্যে নিয়ে আসে উৎসবের ফার গাছ, সোনালী তারা, ঝুমঝুমি, আর নানারকম সব আশ্চর্য খেলনা। কী ভালো এই বুড়ো! সঙ্গে সঙ্গেই সে আলিওনুশকার হাত ধরে নিজের কোটের তলায় তাকে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'এখানে এলি কেমন করে খুকি?'

'আমি রাঙা ফড়িঙের পিঠে দেশভ্রমণ করে এসেছি... কত যে দেখলাম দাদু!'

'বটে, বটে...'

'আমি তোমায় চিনি দাদু! তুমি ছেলেমেয়েদের জন্যে ফার গাছ নিয়ে আসো...'

'বটে, বটে... এখুনি আমি নববর্ষের ফার গাছের ব্যবস্থা করছি।'

তাকে সে একটা লম্বা লগি দেখাল, যা মোটেই ফার গাছের মতো নয়।

'এ কেমন ফার গাছ দাদু? শুধু একটা লাটি...'

'দ্যাখ-না এই বার...'

বুড়ো তাকে নিয়ে এল একটা ছোটো গাঁয়ে, একেবারে বরফে ছাওয়া। বরফের তল থেকে বেরিয়ে আছে কেবল এক-একটা চিমনি আর চালা। গাঁয়ের ছেলেরা বুড়োর পথ চেয়ে ছিল। চেঁচাল তারা:

'ফার গাছ, ফার গাছ!'

প্রথম কুঁড়েটায় এল তারা। ঝাড়াই না-করা এক আঁটি জই নিয়ে বাঁধল লগির ডগায়। তারপর তুলে ধরল তা চালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে উড়ে এল চড়ুইদের মতো ছোটো ছোটো সব পাখি, শীতকালে যারা দক্ষিণে উড়ে যায় না। দানা ঠোকরাতে লাগল তারা।

'এটা আমাদের ফার গাছ!' চেঁচাল তারা।

হঠাৎ ভারি খুশি লাগল আলিওনুশকার। শীতকালে ছোটো ছোটো পাখিদের জন্যে ফার গাছ বানানো যায় কীভাবে, সেটা সে দেখলে এই প্রথম।

বাঃ, কী মজা! কী ভালোমানুষ বুড়ো! একটা চড়ুই ফড়ফড় করছিল সবার চেয়ে বেশি। আলিওনুশকাকে দেখেই সে চিনতে পারলে। চেঁচাল:

'আরে, এযে আলিওনুশকা! খুব ভালো চিনি ওকে... আমায় সে কতবার রুটির ছিটেফোঁটা খাইয়েছে। হ্যাঁ গো...'

অন্য চড়ুইয়েরাও তাকে চিনতে পেরে আনন্দে কিচিরমিচির লাগালে প্রচণ্ড।

উড়ে এল আরো একটা চড়ুই। দেখা গেল ভয়ানক ডানপিটে সে। অন্যদের ঠেলে সরিয়ে দখল করতে লাগল সেরা দানাগুলো। এটা সেই চড়ুই, মাছ মিয়ার সঙ্গে যে ঝগড়া বাধিয়েছিল। আলিওনুশকা চিনতে পারল তাকে।

'নমস্কার চড়ুই!'

সূচি

ভূমিকা ৫

মুখপাত ৮

নির্ভীক খরগোশ — লম্বকর্ণ, ট্যারাচোখো, হ্রস্বপুচ্ছ ১৩

পুনপুনে পোকা ১৯

মশা-দীর্ঘনাসা আর ঝাঁকড়া-ভালুক — লেজ এইটুক ২৭

ভানকার জন্মদিন ৩৫

চড়ুই বাবু, মাছ মিয়া আর ফুর্তিবাজ ঝাড়ুদার ইয়াশা ৪৭

এক যে ছিল শেষের মাছিটি ৫৭

কালোমুণ্ডু কাক আর হলুদ-পরী ক্যানারি ৬৯

সবার চেয়ে বুদ্ধিমান ৮১

দুধ, যবের মণ্ড আর ছেয়ে বেড়াল মুরকা ৯৩

আয় ঘুম ১০১